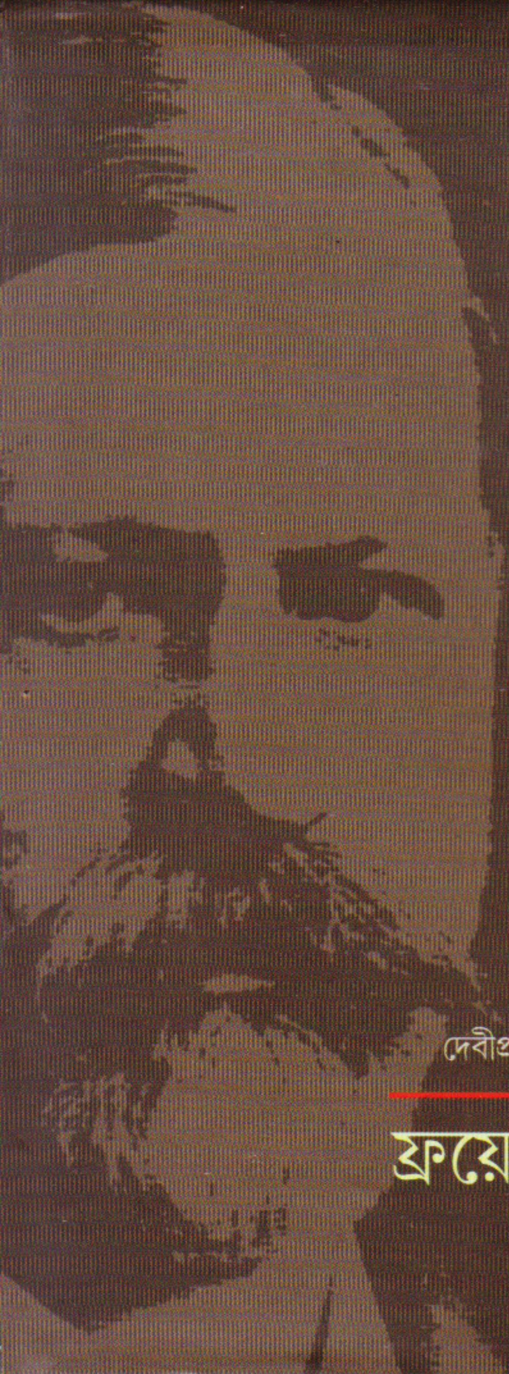

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ফ্রয়েড প্রসঙ্গে

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বাংলা ও বাঙালির পাঠকের কাছে একটি স্মরণীয় নাম। বিংশ শতকের ত্রিশের দশক থেকে তিনি দর্শন ও বিজ্ঞান চিন্তনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন।

শুধু বাংলা ভাষায় নয়, ইংরেজিতে লোকায়ত ও অন্যান্য গ্রন্থ ছাড়াও ভারতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে তিনি তিনখণ্ডে যে গবেষণার কাজ রেখে গেছেন, চিরটা কাল তা গবেষকদের প্রয়োজনে লাগবে।

তিনি ছিলেন 'অনুষ্টুপ' এর একান্ত আপনজন। 'ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে' ছাড়াও তাঁর প্রায় নয়-দশটি সহজসরল ভাষায় লেখা বই অনুষ্টুপ প্রকাশ করেছে। 'ফ্রয়েড প্রসঙ্গে' বইটি অনেক দিন আগে লিখিত হলেও আজও তার প্রাসঙ্গিকতা অনিবার্য বলেই মনে করতেন প্রয়াত দার্শনিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

ISBN 978-81-85479-55-2

দাম ১০০ টাকা

ফ্রয়েড প্রসঙ্গে

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

অনুষ্টুপ
২ই নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

39, Aziz Super Market
বিদিত
BIDITA
Tel: 9663474

দেবীপ্রসাদের জন্ম ১৯ নভেম্বর ১৯১৮। তিনি প্রয়াত হয়েছেন ১৯৯৪ সালে। ১৯৩৯-এ সাম্মানিকস্তরে এবং ১৯৪২-এ দর্শনবিভাগে মাস্টার্স-এ তিনি প্রথম শ্রেণিতে প্রথম। যুক্তিবাদে দীক্ষিত এই মানুষটি সহজ সরল ভাষায় বিজ্ঞান চিন্তায় অগ্রগতির প্রয়াস করেছেন সারাজীবন। দর্শন ও বিজ্ঞান চিন্তায় বাংলাভাষার যে অগ্রগতির কথা রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন তার সার্থক উত্তরসূরি দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। এছাড়া বাংলায় তার অজস্র বই যেমন : *ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে*, *সত্যের সন্ধানে মানুষ*, *ফ্রয়েড প্রসঙ্গে*, *সে যুগে মায়েরা বড়ো*, *ভাববাদ খণ্ডন*, *শোনো বলি মনের কথা*, *ক্ষুদে শয়তানের রাজত্ব* ইত্যাদি।

ফ্রয়েডের দর্শনকে সহজভাবে বুঝতে ও সেই দর্শনকে কীভাবে প্রশ্ন করতে হবে এই বইটিতে সেই কথা লেখা আছে।

অনুমতি ব্যতিরেখে এই বই-এর কোনো অংশের মুদ্রণও
পুনর্মুদ্রণ বা প্রতিলিপিকরণ আইন অনুযায়ী করা যাবে না।

Freud Prasange

By *Debiprasad Chattopadhyay*

প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৩৫৯

অনুষ্টুপ প্রথম সংস্করণ : মাঘ ১৪০০

বইমেলা : ১৯৯৪

অনুষ্টুপ সংস্করণ : ডিসেম্বর ২০১০

@অলকা চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক : অনিল আচার্য

২ই নবীন কুণ্ডু লেন

কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ : রাতুল চন্দ রায়

বর্ণবিন্যাস : কমল পাঁজা, অনুষ্টুপ

মুদ্রক : বেঙ্গল ফোটোটাইপ কোম্পানী

৪৬/১, রাজা রামমোহন রায় সরণী, কলকাতা -৯

ISBN 978-81-85479-55-2

দাম ১০০ টাকা

উৎসর্গ

এ. ডব্লিউ মামুদ

ভূমিকা

ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলের শিক্ষানবিশি করবার সময়ে ফ্রয়েডীয় মতবাদ নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহী হয়ে পড়েছিলাম। মতবাদ-এর দিক থেকে এ-রকম মারাত্মক বিচ্যুতির নমুনা খুব কমই দেখা যায়। এবং আত্মসমালোচনার অবকাশ হয়তো ঘটতোই না যদি না সে-সময়ে লেখা আমার বই 'যৌন-জিজ্ঞাসা'-র অত্যন্ত কঠোর সমালোচনা 'মার্কসবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত না হতো। এদিক থেকে সমালোচক রবীন্দ্র গুপ্তর কাছে আমি ব্যক্তিগতভাবে যে কতোখানি কৃতজ্ঞ তা অল্পকথায় প্রকাশ করা সম্ভবই নয়। অবশ্যই, একটা ভ্রান্ত মতবাদের নেশা একবার ধরলে তা রাতারাতি কাটিয়ে ওঠা কঠিন। নেশা কাটলেও প্রায়ই খোঁয়ারি থেকে যায়। আমি নিজে বেশ স্পষ্টভাবে বুঝতে পারি আমারও সেই দশা গিয়েছে বেশ কিছুদিন ধরে। ফ্রয়েডবাদ প্রকাশ করবার সাহস যে এতোদিনে হলো তার আসল কারণ, এতোদিনে পাভ্‌লভবাদের সঙ্গে পরিচয়ের নির্ভরে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মনোবিজ্ঞানের রূপটা চোখে পড়েছে বলে ভরসা হচ্ছে। আপাতত পাভলভ নিয়ে আরো অনুশীলন করছি। সাহস যখন পাবো তখন "পাভলভ-প্রসঙ্গে" বলে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করবো বলে মনস্থ করেছি। বাংলা ভাষায় ভ্রান্ত মনস্তত্ত্ব প্রচারের কলঙ্ক তাতে কিছুটা মুছবে।

পাঠকবর্গের কাছে একটা ব্যক্তিগত মার্জনা চাইবার আছে। বইটি ছাপাখানায় যাবার পরই আমি কলকাতা ছেড়েছি। এতোদূরে বসে লেখাটাকে শেষবারের মতো মাজাঘষা করা সম্ভব হলো না। অন্তত, শেষ অংশকে আর একটু মাজাঘষা করতে পারলে তৃপ্তি পেতাম।

এ-বইয়ের অংশ-বিশেষ 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত হয়েছিলো। এই সুযোগে 'পরিচয়'-সম্পাদকের কাছে কৃতজ্ঞতা জানালাম।

লন্ডন
২৫.১০.৫২ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশকের নিবেদন

১৯৫১-৫২ সালে লিখিত 'ফ্রয়েড প্রসঙ্গে' গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রণ হলো এত বছর বাদে। লেখক জীবিত থাকলে এই বইটি পুনর্লিখিত হতো। তিনি তাঁর পূর্ব প্রকাশিত বইগুলির আধুনিক সংস্করণ প্রকাশ করার বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী হয়ে পড়েছিলেন শেষদিকে। শরীর ও স্বাস্থ্যের কারণে তা আর সম্ভব হয়নি।

বিগত কয়েক বছরে সোবিয়েৎ সমাজতন্ত্রের সাময়িক বিপর্যয়ে সারা পৃথিবীতে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে। দেবীপ্রসাদও এ-সব বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। সে চিন্তা-ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে তাঁর শেষদিকের লেখাগুলিতে।

দেবীপ্রসাদের এই বইটি এবং অন্যান্য যে বইগুলি পুনর্মুদ্রণ করা হলো, তার মূল বস্তুতে কোন পরিবর্তনের দরকার আছে বলে মনে হয় না। বৈজ্ঞানিকভাবে পূর্বতন ধ্যানধারণার পুনর্বিচার এবং সেই বিচারের জনপ্রিয়করণই ছিল বইগুলি লেখার উদ্দেশ্য। অসাধারণ প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি তা করেছেন এবং বইগুলি সেজন্যই আজও সমান জনপ্রিয়। আশা করি, দেবীপ্রসাদের অগণিত পাঠক এ-বিষয়ে একমত পোষণ করবেন।

বইটির প্রকাশের ক্ষেত্রে বিশেষ সহযোগিতা করেছেন অলকা চট্টোপাধ্যায়। তাঁর অনুমতি ছাড়া এ-বইটি প্রকাশিত হতে পারত না। নিজে সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে প্রুফ সংশোধন করেছেন অশোক উপাধ্যায়। তাঁর কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

অনুবন্ধ

ফ্রয়েডীয় মতবাদের সমর্থনে ফ্রয়েডপন্থীদের পক্ষে এমন এক সুবিধে আছে যা বিজ্ঞানের কোনো ক্ষেত্রে, এমন কি দার্শনিক মতবাদের বেলাতেও, আর কখনো চোখে পড়েনি। সুবিধেটা হলো, বিপক্ষ-সমালোচনার মধ্যে মনোবিকারের লক্ষণ আবিষ্কার করবার দাবি। বিশেষ করে সে-সমালোচনার সঙ্গে যদি কোনো রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের যোগাযোগ থাকে তাহলে তো কথাই নেই! কেননা, ফ্রয়েডপন্থী অনায়াসেই বলবেন, রাজনীতি নিয়ে উৎসাহের পেছনে মানসিক গরমিলের পরিচয় থাকা সম্ভব, —এবং রাজনীতিটা যদি বৈপ্লবিক হয় তা হলে তাঁর মতে এই সম্ভাবনা প্রায় সুনিশ্চয়ের কোঠায় পৌঁছোবার কথা।

অথচ, এই বইতে ফ্রয়েডীয় মতবাদের বিবরণ-মাত্র দিতে বসিনি। সমালোচনা করবার প্রয়াসীই হয়েছি। সে-সমালোচনার সঙ্গে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের যোগাযোগও থাকবে। রাজনীতিটা অহিংস নয়, বৈপ্লবিক। এক কথায় মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ফ্রয়েডীয় মতবাদ নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। তাই, ফ্রয়েডীয় মতবাদের দিক থেকে এ-সমালোচনাকে অগ্রাহ্য করবার যে-দুটি প্রাথমিক দাবি হবে, শুরুতে পূর্বপক্ষ হিসেবে সেই দুটি দাবির জবাব দেওয়া দরকার।

একে একে দুটি কথার আলোচনা করা যাক।

প্রথমত, বিরুদ্ধ সমালোচনার মধ্যে মনোবিকারের লক্ষণ আবিষ্কার করবার দাবি। মনে রাখতে হবে, এ-দাবি একমাত্র ফ্রয়েডবাদেরই। তার মানে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং দার্শনিক

মত পেশ করবার পর বিরুদ্ধ সমালোচনা—তুমুল সমালোচনা —বহুবারই শোনা গিয়েছে। কিন্তু তার জবাবে এ-কথা আর কখনো শোনা যায়নি যে, সমালোচকদের এতো যে সোরগোল তা শুধু তাঁদের মানসিক গণ্ডগোলেরই পরিচয়। কোপার্নিকাস যখন প্রথম ঘোষণা করলেন সূর্যের চারপাশেই পৃথিবীর আবর্তন, পৃথিবীকে ঘুরে সূর্যের আবর্তন নয়, তখন কোপার্নিকাসের বিরুদ্ধে সোরগোল খুব কম হয়নি। কিংবা জীবজগতে বিবর্তনের কথা পেশ করবার পর ডারউইনের বিরুদ্ধে তীব্র আর তুমুল সমালোচনার তুফান নিশ্চয়ই উঠেছিল। আজো, লাইসেন্‌কো জীববিজ্ঞানে যে-বিপ্লব ঘোষণা করেছেন তার বিরুদ্ধে সমালোচনার অন্ত নেই। দার্শনিক মতবাদের বেলাতেও অনেক সময়ই এই রকম। দিদারো, ফয়ারবাখ, এঙ্গেল্‌স্—অনেক দার্শনিকের নাম মনে পড়ে। অনেকের বিরুদ্ধেই তীব্র তুমুল সমালোচনা। কিন্তু উত্তরে এ-পর্যন্ত আর কাউকে দাবি করতে দেখা যায়নি যে সমালোচনাগুলি আসলে এক রকমের পাগলামি বিশেষ। বাস্তব দৃষ্টান্ত, বাস্তব অভিজ্ঞতা আর যুক্তিতর্ক দিয়েই বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক সমস্যার কিনারা করবার প্রথা। কিন্তু ফ্রয়েডপন্থীরা শুধু এইটুকুকেই পূর্বপক্ষ-খণ্ডনের একমাত্র পন্থা বলে স্বীকার করতে সম্মত হবেন না। যেমন ধরুন, কেউ হয়তো তীব্র সমালোচনা করে বললেন, "জিঘাংসা-বৃত্তি নাম দিয়ে ফ্রয়েড যে সহজ বৃত্তির কথা উল্লেখ করেন সেটা আসলে অতিকথা মাত্র।" উত্তরে ফ্রয়েডপন্থী সহজেই বলবেন, সমালোচকের নিজের মনে এই সহজবৃত্তির উৎপাত নিশ্চয়ই বেশি, তা নইলে একে অস্বীকার করবার এমন উৎসাহ আসবে কোথা থেকে? ঠাকুর ঘরে কে রে—না, আমি তো কলা খাইনি! তর্ক করে সমালোচক হয়তো বলবেন, তা কেমন করে হবে? নিজের মনেই যদি

এ-হেন সহজবৃত্তির উৎপাত থাকতো তাহলে অন্তত নিজে তো তার কথা টের পেতুম! উত্তরে শোনা যাবে, তা হয় না; কেননা, নিজের মনের পুরো খবরটা নিজে নিজে পাওয়া যায় না।

ফ্রয়েডীয় মতবাদের এই বিশেষ সুবিধেটার ভিত্তি ঠিক কী, এইবারে তা স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যাবে। ভিত্তিটা হলো, আলোচ্য বিষয়ের এক বিশেষ সংজ্ঞা-নিরূপণ। ফ্রয়েড বলেন, নির্জ্ঞান মন নিয়ে তাঁর আলোচনা, নির্জ্ঞান বলতে তিনি বোঝেন মানব-মনের অজানা আর গভীর এক প্রদেশ। তার মানে, ফ্রয়েডের মতে আমরা নিজেরা যথাসাধ্য চেষ্টা করে নিজেদের মন সম্বন্ধে মাত্র সামান্য আর ভাসাভাসা খবর জোগাড় করতে পারি, সেটুকু তাই আমাদের মনের আসল পরিচয় নয়। কেননা আমাদের মনের আসল দিকটার কথা আমরা নিজেরা সব সময় নিজেদের কাছ থেকেই লুকোতে ব্যস্ত। ওই ভাগটারই নাম হলো নির্জ্ঞান। এবং ফ্রয়েডের মতে আমাদের যা-কিছু চিন্তা, যা-কিছু সচেতন ব্যবহার তার সবটুকুই ওই নির্জ্ঞানের নিয়ন্ত্রণ মেনে চলে। অবশ্যই প্রশ্ন উঠবে, নির্জ্ঞান মনটা কেন নির্জ্ঞান? আমাদের মনেরই প্রধান দিক অথচ আমরাই তার খবর পাইনে—এমন ব্যাপার সম্ভব হয় কেমন করে? উত্তরে ফ্রয়েড বলবেন। আমাদের মনের মধ্যে সদা-সর্বদা একটা চেষ্টা রয়েছে ওই নির্জ্ঞানকে চেপে রাখবার, ওর বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টি করবার। সেই বাধা উত্তীর্ণ হয়ে নির্জ্ঞানের বিষয়টুকু সজ্ঞানের স্তরে উঠে আসতে পারে না—দেউড়ির পাহারাদারকে পেরিয়ে যে-রকম মুক্ত রাজপথে বেরিয়ে আসতে পারে না কয়েদখানার বাসিন্দারা। কিংবা পাহারাদারকে ফাঁকি দিয়ে কয়েদীরা যদি একান্তই বেরিয়ে আসতে চায়, তাহলে তাদের পক্ষে ছদ্মবেশ পরবার দরকার। আমাদের মনের বেলাতেও ওই রকম : সজ্ঞান সমাজ-বোধের

পাহারাদারি পেরিয়ে নির্জ্ঞানের কথা যদি সজ্ঞানের স্তরে উঠে আসতে চায় তাহলে ছদ্মবেশ ছাড়া গতি নেই। এই-জাতীয় হরেক রকম ছদ্মবেশের বর্ণনা ফ্রয়েডীয় গ্রন্থাবলীতে। দৈনন্দিন খুঁটিনাটির ভুলচুক আর হাসিতামাসা থেকে শুরু করে স্বপ্ন এবং মনোবিকারের লক্ষণ পর্যন্ত কতোই না।

ফ্রয়েডীয় মতবাদের এই মূল দাবি মনে রাখলে বুঝতে পারা যাবে, বিপক্ষ আলোচনার মধ্যে মনোবিকারের লক্ষণ খোঁজবার ব্যাপারে ওঁদের সঙ্গতিটা ঠিক কোথায়। ওই নির্জ্ঞান মনের কথা যদি বৈজ্ঞানিক বাস্তব হয়, এবং ফ্রয়েডীয় আলোচনার প্রধান উৎসাহ যদি ওই নির্জ্ঞানের উপর আলোকপাত করবার চেষ্টাই হয়, তাহলে সে-আলোচনার বিরুদ্ধে আমাদের তরফ থেকে প্রতিবন্ধ জাগা তো স্বাভাবিকই; সভ্যমানুষ সদাসর্বদা নিজের সম্বন্ধে যে-কথা এমন কি নিজের কাজ থেকেও গোপন করতে চায়, সেই কথা প্রকাশ করে দেবারই প্রধান তাগিদ ফ্রয়েডের, ফলে ফ্রয়েডের বিরুদ্ধে সভ্যমানুষের স্বাভাবিক আপত্তি। এবং তার আপত্তিই ততো বেশি যার নিজের মনে নির্জ্ঞান মনের উৎপাত যতো প্রবল। কেননা, তার মনে সজ্ঞানে-নির্জ্ঞানে রফা হয়নি, দুয়ের মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব। অতএব, ফ্রয়েডবাদের বিরুদ্ধে আপত্তির বহর দেখেই আন্দাজ করা চলে কার মনে সজ্ঞানে-নির্জ্ঞানে দ্বন্দ্বটা কী রকম। ফ্রয়েডীয় মতে এই দ্বন্দ্বের নামই হলো মনোবিকার। তাই বিপক্ষ সমালোচনার মধ্যে মনোবিকারের লক্ষণ।

অবশ্যই প্রশ্ন উঠবে, বিরুদ্ধ সমালোচনা যদি একান্তই প্রতিবন্ধ-প্রসূত হয় তাহলে কি ফ্রয়েডবাদকে ধ্রুব সত্য বলে সোৎসাহে মেনে নেওয়াই সুস্থ ও বৈজ্ঞানিক মনের একমাত্র পরিচয়? ফ্রয়েড বলবেন, তাও নয়। অতিভক্তিটা আবার যে

চোরের লক্ষণ! মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহ নিয়ে ফ্রয়েডবাদের কাছে আত্মনিবেদন করবার ভঙ্গিটাও ফ্রয়েডের মতে ওই একই প্রতিবন্ধের উলটো দিক মাত্র, কেবল এর মধ্যে এমন এক চালাকি আছে যে প্রতিবন্ধের পরিচয়টা চট করে চোখে পড়ে না। দৈনন্দিন ব্যবহারের মধ্যেও এ-রকম চালাকির নমুনা দুর্লভ নয়। যেমন ধরুন, একজন কেউ এমন সব কথা বলছে বা এমন মত প্রকাশ করছে যা আমার কাছে একেবারে বিরক্তিকর মূর্খতার সামিল। আমি তার সঙ্গে জোর গলায় তর্ক করতে পারি। কিন্তু যদি চালাকি করতে চাই তাহলে হয়তো খুব সোজাসুজি—এমন কি সোৎসাহ বিস্ময়ের অভিনয় করে—তার সব কথা সরাসরি মেনে নিয়ে তার মুখ বন্ধ করে দেবো। তার কথা তখন আর আমার স্পর্শও করবে না, বিব্রতও করবে না।

প্রশ্ন হলো, তাহলে? যদি বিরূপ সমালোচনা আর সোৎসাহ স্বীকৃতি দুয়ের পিছনেই মানসিক গণ্ডগোলের পরিচয় থাকে তাহলে কি ফ্রয়েডীয় মতে ফ্রয়েডবাদকে যাচাই করবার—এমন কি সম্যকভাবে চেনবার আর বোঝবার—কোনো পথই নেই? উত্তরে ফ্রয়েড যে-কথা বলছেন তা সত্যিই অতি-দুরূহ এক দাবি: বই পড়ে বা মাথা ঘামিয়ে এ-মতবাদকে চেনা-জানা যায় না, এর যাথার্থ্য-বিচার তো দূরের কথা। (১) ফ্রয়েড বলছেন, একে চেনবার-জানবার একমাত্র পথ হলো সহৃদয়-সংশয়ের (benevolent scepticism-এর) মনোভাব নিয়ে কোনো এক ফ্রয়েডপন্থীর কাছে আত্মনিবেদন করতে হবে। (২) তিনি জানেন, মনের প্রতিবন্ধ ভাঙবার কৌশলটা ঠিক কী, যদিও অবশ্য দুঃখের বিষয় এ-ব্যাপারে সহজ আর সিধে কোনো পথ এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। সাধারণত ফ্রয়েডীয় কৌশলে পারদর্শী ফ্রয়েডপন্থীর পক্ষে কাজ সমাধা করবার জন্যে একটানা দু-তিনশো দিন ধরে দৈনিক

একঘণ্টা করে চেষ্টার আয়োজন। তাছাড়া, এই কলাকৌশলেরই একটা অঙ্গ হলো নগদ-দক্ষিণা (রুপোর টাকায়) গ্রহণ করা। তা নইলে কাজ কবে না। ফলে, ব্যাপারটা শুধু সময়-সাপেক্ষই নয়, ব্যয় সাপেক্ষও। তবু ফ্রয়েডীয় মতে এ ছাড়া আর কোনো পথ নেই। এইভাবে নিজের উপর একান্ত ব্যক্তিগত প্রয়োগ না দেখলে ফ্রয়েডের মতে তাঁর মতবাদ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা পাওয়াই সম্ভব নয়, সমালোচনার অধিকার তো দূরের কথা। মনে রাখতে হবে, ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলে শিক্ষা লাভ করবার ব্যাপারেও প্রথমে নিজের উপর এর প্রয়োগ করানোর নির্দেশ। অর্থাৎ, সাধারণ রোগীর চিকিৎসা করবার সময় ফ্রয়েডপন্থী যেমনভাবে দীর্ঘ দিন ধরে রোগীর উপর তাঁর পদ্ধতির প্রয়োগ করেন, ঠিক তেমনিভাবেই শিক্ষার্থীর উপরও প্রয়োগ করবেন ওই একই পদ্ধতি। (৩) তাঁর যুক্তিটা সহজ: এইভাবে শিক্ষার্থীর পক্ষে শুধুই যে ফ্রয়েডীয় কলাকৌশল সম্বন্ধে অপরোক্ষ পরিচয় পাবার আশা তাই নয়, ফ্রয়েডবাদের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীর সভ্য মনে যে স্বাভাবিক প্রতিবন্ধ তা দূর করবারও এই হলো একমাত্র পথ।

ফ্রয়েডীয় কলাকৌশল এবং তাঁর মতবাদের বিভিন্ন দিকগুলি নিয়ে পরে খুঁটিয়ে আলোচনা তুলবো। কিন্তু তার আগে যে-কথা শুরু করেছিলাম—অর্থাৎ ওই সমালোচনার অধিকার নিয়ে কথা। স্পষ্টই দেখা যায়, অধিকারভেদের কথা তুলে ফ্রয়েডপন্থী ব্যাপারটাকে একান্ত ব্যক্তিগত এক স্তরে নিয়ে যেতে চান। এ দাবির বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য যাই হোক না কেন, সমালোচককে বিব্রত করবার ব্যাপারে এর ব্যবহারিক মূল্য আছে। কেননা, এর প্রকৃত বৈজ্ঞানিক উত্তর দিতে গেলে বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণ-অপ্রমাণের নির্ভরে দেখানো দরকার যে, যে-মূলসূত্রগুলির উপর এ-দাবি প্রতিষ্ঠিত সেগুলিই সংশয়াত্মক বা ভ্রান্ত। অথচ, সেই প্রচেষ্টাকেই

ফ্রয়েডপন্থীরা অনায়াসে প্রতিবন্ধ-প্রসূত বলে উড়িয়ে দেবার সুযোগ পাবেন। তাই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্তরেই সমালোচকের পক্ষে যদি কোনো জবাব দেবার অবসর থাকে তাহলে অন্তত কৌশল হিসেবে তার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কৌশল হিসেবে বলছি, কেননা বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানম্মন্য মতবাদের বিচারে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা- অনভিজ্ঞতার সাক্ষ্য তো সত্যিই সংকীর্ণমূল্য; তবুও তার উল্লেখ অন্তত ফ্রয়েডপন্থীকে সন্তুষ্ট করবে—নইলে তো তিনি স্বপক্ষদোষে দুষ্ট হবেন। প্রসঙ্গত বলে রাখা যায় যে সমালোচনা-সূত্রে আরো অগ্রসর হলে আমরা দেখতে পাবো ফ্রয়েডের এই দাবি এক বিশেষ সামাজিক দৃষ্টিকোণের অনিবার্য পরিমাণ মাত্র। সমাজতত্ত্বের প্রচলিত পরিভাষায় তার নাম বুর্জোয়া শ্রেণীর দৃষ্টিকোণ—যা কিনা, একান্তই আত্মকেন্দ্রিক ও ব্যষ্টিকেন্দ্রিক (subjective ও individualistic) হতে বাধ্য। তাই, সমালোচনার যাথার্থ্য তাঁর কাছে শুধুমাত্র বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণ-অপ্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়—অধিকারভেদের, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মুখাপেক্ষী।

সামাজিক দৃষ্টিকোণের কথা পরে তোলা যাবে। আপাতত, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার এজলাসে আমার জবানবন্দিটুকু পেশ করা যাক—যদিও স্পষ্ট ভাবেই বলে রাখতে চাই যে পূর্বপক্ষ-খণ্ডনের এক কৌশল হিসেবেই এই প্রচেষ্টা, অর্থাৎ কিনা বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বিচারের এজলাসে এই জবানবন্দির মূল্য সত্যিই সংকীর্ণ। জবানবন্দিটা হলো, শিক্ষার্থী হিসেবে দীর্ঘ দিন ধরে দৈনিক একঘণ্টা করে ফ্রয়েড-গোষ্ঠী-স্বীকৃত সুকৌশলী ফ্রয়েডপন্থীর কাছে আমি আত্মনিবেদন করেছিলাম এবং অপরোক্ষভাবে ফ্রয়েডীয় পদ্ধতির প্রয়োগ ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজের উপর হতে দেখেছি এবং শেষ পর্যন্ত ফ্রয়েডসমাজ আমাকে

জানিয়েছিলেন যে শিক্ষার্থীর পক্ষে যতোখানি গভীরভাবে এই পদ্ধতির সাহায্যে আত্মোপলব্ধির প্রয়োজন আমার ক্ষেত্রে তা সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা দরকার, ফ্রয়েডপন্থীর মতেই সাধারণ রোগীর রোগলক্ষণ নিবারণের জন্যে যতোখানি গভীর মনঃসমীক্ষণ প্রয়োজন, শিক্ষার্থীর পক্ষে প্রয়োজন তার চেয়েও বেশি। আশা করি এই আত্মকাহিনীর নজির তোলবার পর ফ্রয়েডপন্থীরা আমার সমালোচনায় যুক্তিতর্ক ও বাস্তব দৃষ্টান্তর দোষত্রুটি অন্বেষণ করবেন—আমার ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতিতে গরমিল আছে, এমনতরো দাবি করে আমার সমালোচনার জবাব দেবেন না। বলাই বাহুল্য, এই কৈফিয়তটা শুধুমাত্র প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্যে, প্রতিবন্ধ-সংক্রান্ত ফ্রয়েডীয় সমালোচনা নয়। সে-সমালোচনা পরে তোলা হবে।

কিন্তু রাজনৈতিক উৎসাহ? রাজনৈতিক মতবাদ? বিশেষ করে বৈপ্লবিক রাজনীতি? ফ্রয়েডপন্থীর কাছে যে এ-জাতীয় উৎসাহের অন্তত চোদ্দ আনা প্রেরণাই হলো নির্জ্ঞান মনের সমীক্ষণ-সাপেক্ষ পিতৃদ্রোহ। এখানে ফ্রয়েডীয় বক্তব্যটার সঙ্গে সাধারণের অভিজ্ঞতা এবং ধারণার এতো তফাত যে সে-বক্তব্যের জবাব দেবার আগে বক্তব্যটা একটু বিশদ করা দরকার। ফ্রয়েডের মতে নিতান্ত শৈশবদশা থেকেই মানুষের মনে—পিতৃশাসনের বিরুদ্ধে একটা তীব্র আপত্তি আর বিদ্বেষ জমা হতে থাকে। তার কারণ, ফ্রয়েড বলেন, শিশুর কাছে অবাধ সুখভোগের আকাঙ্ক্ষাই জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, অথচ শিশুর ক্ষুদ্র জগৎটুকুর মধ্যে পিতৃশাসনই এর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো বাধা। তাই বিদ্বেষ, পিতৃদ্রোহ। অবশ্যই বয়স বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক অভিজ্ঞতা এবং সামাজিক নীতি-শিক্ষার চাপে এই বিদ্বেষ, এই বিদ্রোহ, আমরা মনের গোপনে লুকিয়ে ফেলবার চেষ্টা করি। অর্থাৎ

ফ্রয়েডের পরিভাষায়, নির্জ্ঞানের মধ্যে একে নির্বাসনে পাঠাই। কিন্তু নির্জ্ঞানে নির্বাসিত হলেও ওই পিতৃদ্রোহ মরে না, উপে যায় না। বয়ঃপ্রাপ্তির পরেও মনের মধ্যে টিঁকে থাকে। আর যদি টিঁকেই থাকে তাহলে তার পক্ষে চরিতার্থতা খোঁজবার পথই হবে একমাত্র পথ। কিন্তু সোজাসুজি চরিতার্থতার পথে বাধা দেখে ছদ্মবেশী চরিতার্থতার পথ খুঁজতে চায়। ছদ্মবেশী চরিতার্থতা নানান রকমের। তার মধ্যে এক রকম হলো বৈপ্লবিক রাজনীতি। কিন্তু কেন? কেমন করেই বা? ফ্রয়েডপন্থী বলবেন, পরিণত বয়সে আমরা যখন পারিবারিক অভিজ্ঞতার ক্ষুদ্র গণ্ডিটুকু থেকে বেরিয়ে বৃহত্তর সমাজ-জীবনের পরিধির মধ্যে গিয়ে পড়ি, তখন আমাদের কাছে পিতাই আর একমাত্র শাসক—একমাত্র কর্তৃপক্ষ—নন। শাসক বলতে—কর্তৃপক্ষ বলতে—তখন সরকার, সরকারী ব্যবস্থা, আমলা, রাজপুরুষ। ফ্রয়েডীয় পরিভাষায় এ-সবই হবে পিতৃ-প্রতীক, 'ফাদার-ইম্যাগো'। অর্থাৎ শিশুমনের কাছে পিতা যেভাবে শাসকের জায়গা জুড়ে ছিলেন পরিণত মনের কাছে এইগুলিই সেই রকম জায়গা জুড়ে থাকে। তাই, শৈশবের ওই সঞ্চিত পিতৃ-বিদ্বেষ পরিণত বয়সে এই পিতৃ-প্রতীকগুলির উপর গিয়ে পড়ে। অর্থাৎ বিপ্লবের মনোভাব। বৈপ্লবিক রাজনীতি। অবশ্যই, দায়িত্বশীল ফ্রয়েডপন্থী স্বীকার করবেন যে রাজনীতির মধ্যে ষোলো আনাই এই রকম নির্জ্ঞান মনের পিতৃ-বিদ্বেষ নয়। অর্থাৎ, রাজনীতির মধ্যে কিছুটা শুদ্ধ ও নির্মল রাজনৈতিক হিসেব-নিকেশের পরিচয় থাকতে পারে। কিন্তু রাজনীতির মধ্যে আবেগ-উত্তেজনার যে-দিক সেটা নির্জ্ঞানের পিতৃদ্রোহই। এবং অনেকের ক্ষেত্রে, ফ্রয়েডপন্থী বলবেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই—নির্জ্ঞানের জটিলতা, সচেতন মনের তথাকথিত নির্মল হিসেব-নিকেশকে অজুহাত হিসেবে

নিজের কাজে ব্যবহার করে নেয়। যেমন ধরুন, আমাদের দেশের হালের ইতিহাসে সাধারণ মানুষ "বন্দেমাতরম" বলে বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠেছিলো। এর পিছনে কি শুধুই নির্মল রাজনৈতিক চেতনার পরিচয়? ফ্রয়েডপন্থী নিশ্চয়ই তা স্বীকার করবেন না। তিনি বলবেন: মানুষের মনের কাছে জননী আর জন্মভূমি এক জিনিস। অর্থাৎ মাতৃভূমি হলো মাতৃপ্রতীক, 'মাদার-ইম্যাগো'। এবং ফ্রয়েডীয় মতে শিশুমনের সবচেয়ে বড়ো চাহিদা মাকে ভোগ করবার আকাঙ্ক্ষা (ইডিপাস কমপ্লেকস্)। আসলে ওই পিতৃ-বিদ্বেষের মূলেও রয়েছে এই ভোগাকাঙ্ক্ষা : মাকে একান্তভাবে পাবার সবচেয়ে বড়ো বাধা হলো বাবা, অবাধ উপভোগের যে-চাহিদা তার বিরুদ্ধে পিতার শাসনই সবচেয়ে কঠিন। এখন, মাতৃভূমি যদি মাতৃ-প্রতীক হয় আর মানুষ যদি দেখে তার এই মাতৃ-প্রতীককে বিদেশী শাসকের দল এমনভাবে উপভোগ করছে, যে তার নিজের পক্ষে উপভোগের সম্ভাবনা বন্ধ—অর্থাৎ বিদেশী শাসকের দল হয়ে দাঁড়িয়েছে নিখুঁত পিতৃ-প্রতীক—তাহলে দেশের মানুষ তো মায়ের নামে ক্ষেপে উঠবেই। "বন্দেমাতরম" বলে ওই ছোট্ট আওয়াজটুকুর মধ্যে অমন অদ্ভুত যাদুশক্তির যোগানটা ঠিক কোথা থেকে তার হদিস দিয়ে ফ্রয়েডপন্থী তাই বলতে চাইবেন, এর ভিতর একটি গূঢ় মানসিক তত্ত্বকে সর্বাঙ্গীণভাবে ব্যবহার করবার নিপুণ আয়োজন রয়েছে যে।

তর্ক তুলে আপনি হয়তো বলবেন, বাস্তব পৃথিবীর চাক্ষুষ অভাব-অভিযোগগুলো তাহলে কি কিছু নয়? শিশুমনের একটা আজগুবি অক্রোশই সব হলো? পলাশীর প্রাঙ্গণ থেকে জালিয়ানওয়ালাবাগ, জালিয়ানওয়ালাবাগ থেকে সাতচল্লিশের দেশ-ভাগ—সব কিছুই হলো গৌণ, নিমিত্তমাত্র? ফ্রয়েডপন্থী

বলবেন, তাই-ই। তা নইলে অমন আক্রোশের ভাবটা আসে কোথা থেকে? আবেগ-উত্তেজনায় অমন আত্মহারা হয়ে পড়া কেন? রাজনীতির প্রেরণাটা যদি নিছক বাস্তববোধ থেকেই সঞ্চারিত হতো তাহলে রাজনীতির আবহাওয়াটা হতো শান্ত, নির্লিপ্ত—বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের আবহাওয়াটা যে-রকম। আঁক কষবার সময় আমরা যে-রকম স্থির অবিচলিত, বৈপ্লবিক আওয়াজ তোলবার সময় তো আর তা নই। তার কারণ, গণিতের হিসেব-নিকেশের খুঁটি হলো বাস্তববোধ, আর বৈপ্লবিক চেষ্টার ভিত্তিতে নির্জ্ঞানের আবেগ।

এর পরও যদি আপনি নেহাত নাচার না হন তাহলে হয়তো প্রশ্ন তুলবেন: তাহলে সব দেশে সব যুগে তুমুল বৈপ্লবিক আন্দোলন চলছে না কেন? বিদেশী শাসক না থাকলেও অন্তত স্বদেশী শাসক তো সর্বত্রই; বিদেশী শাসকের তাঁবে দিন কাটে এমন দৃষ্টান্তও তো কম নয়। অর্থাৎ, ফ্রয়েডীয় পিতৃ-প্রতীক তো সর্বত্রই এবং ফ্রয়েডীয় মতে নির্জ্ঞানের অন্ধ পিতৃদ্রোহটাও এমন কিছু একটা বিশেষ কালের মানব মনস্তত্ত্বের লক্ষণ নয়! অথচ, ইতিহাস-বিচারে দেখতে পাওয়া যায় যখন-তখন বিপ্লব হয় না, বৈপ্লবিক আন্দোলনের জন্যে বৈপ্লবিক পরিস্থিতির প্রয়োজন। এবং বৈপ্লবিক পরিস্থিতি বলতে একান্ত বাস্তব, একান্ত পার্থিব জিনিস বোঝায়—মোহমুক্ত সমাজতত্ত্ববিদ্ নিখুঁত বৈজ্ঞানিক হিসেব করে তার নিভুল রূপ নির্ণয় করতে পারেন। এই যুক্তি ফ্রয়েডপন্থীকে হয়তো কিছুটা টলাতে পারে। তবুও তিনি নিশ্চয়ই আত্ম-প্রকল্প-ভ্রষ্ট সহজে হবে না। হয়তো জবাব দিয়ে বলবেন, বাস্তব পরিস্থিতির কথাটাকে তো উড়িয়ে দেবার দরকার নেই; এ-কথা অস্বীকার করে কী হবে যে বৈপ্লবিক পরিস্থিতি ছাড়া বৈপ্লবিক আন্দোলন হয় না। তবু ওই পরিস্থিতিটুকুকেই বৈপ্লবিক

আন্দোলনের মূল কারণ বলা চলবে না। মূল কারণ নির্জ্ঞান আবেগের গরমিল, যে-গরমিল অন্য বাস্তব পরিস্থিতি পেলে তাকে আশ্রয় করে রাজনৈতিক বিপ্লব সৃষ্টি করে, বাস্তব পরিস্থিতি না পেলে অন্য কিছুকে অবলম্বন করে অন্য পথে আত্মচরিতার্থতা অন্বেষণ করে। উপমা দিয়ে ফ্রয়েডপন্থীর বক্তব্যটুকু ব্যাখ্যা করা যায়: অন্ধকার পথে মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালাতে গিয়ে কেউ হয়তো একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। অন্ধকার না থাকলে বা হাতে গাড়ি না থাকলে দুর্ঘটনা ঘটতো না নিশ্চয়ই। কিন্তু এগুলিই তো দুর্ঘটনার কারণ নয়। আসল কারণ হলো, চালকের মত্ত অবস্থা। হাতে গাড়ি না পেলে অন্য কিছুকে অবলম্বন করে অন্য কোনোভাবে তার মাতলামি আত্মপ্রকাশ করতো হয়ত! (৪)

এ কথা অবশ্যই স্পষ্ট যে বৈপ্লবিক রাজনীতি সম্বন্ধে ফ্রয়েডীয় মন্তব্যগুলি তাঁর কয়েকটি মূল প্রকল্পের নিগমন-বিশেষ। ফলে সেই মূল প্রকল্পগুলি নিয়ে আলোচনা তোলবার আগে রাজনৈতিক উৎসাহ সম্বন্ধে ফ্রয়েডীয় মতবাদের পূর্ণাঙ্গ জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। এবং আত্ম-অভিজ্ঞতার পুনরুল্লেখ-প্রচেষ্টা জবাবদিহির মতো শোনাবে, জবাব হবে না। আপাতত তাই পূর্ণাঙ্গ জবাব দেবার চেষ্টাও করবো না, জবাবদিহির চেষ্টাও নয়। কিন্তু এখানে ফ্রয়েডপন্থীদের আত্মপক্ষ-দোষটুকু বর্ণনা করা অন্তত চিত্তাকর্ষক হবে। আত্মপক্ষ-দোষ বলতে বোঝাতে চাই, রাজনৈতিক উৎসাহের এই বিশ্লেষণকে যদিও আপাতত রাজনীতি-নিরপেক্ষ হবার ডাক বলে ভ্রম হতে পারে, তবুও প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ দাঁড়ায় এক নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের প্রতি পক্ষপাতী হবার উমেদারিই। আর তাছাড়া যতো দিন যাচ্ছে ততোই বাস্তব রাজনীতিতে ফ্রয়েডপন্থীরা পক্ষপাতটুকু প্রকট থেকে প্রকটতর হয়ে পড়ছে। অর্থাৎ, মতবাদগত তাৎপর্যের দিক এবং বাস্তব

রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিক—দুদিক থেকেই ফ্রয়েডপন্থীরা রাজনৈতিকভাবে মোটেই অনাসক্ত এবং অপক্ষপাতী নন, এক সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক পক্ষের apologists মাত্র। এই কথাটি মনে না রাখলে ফ্রয়েডতত্ত্বের স্বরূপ স্পষ্টভাবে বুঝতে পারাই সম্ভব হবে না।

মতবাদগত তাৎপর্যের দিক থেকে ফ্রয়েডবাদের রাজনৈতিক পক্ষপাতটা কী-রকম প্রথমে তার আলোচনা করা যাক।

ফ্রয়েডপন্থী বলছেন, রাজনীতি নিয়ে উৎসাহটা সুস্থ আর স্বাভাবিক মনের পরিচয় নয়। কিন্তু এ-কথায় তো কোনো সন্দেহ নেই যে বাস্তব সমাজে, বাস্তব পৃথিবীতে, রাজনীতি বলে ব্যাপারটা একটা ধ্রুব সত্য। ফ্রয়েডীয় মতে, রাজনীতির মধ্যে সুস্থ মনের পরিচয় থাক আর নাই থাক বাস্তবভাবে প্রত্যেক যুগের মতো আজকের দিনেও একটা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করবার আয়োজন করছে। এ-ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে রাজনৈতিক নিরুৎসাহের একমাত্র অর্থ কী হবে? বাস্তবভাবে আমাদের জীবনের উপর যে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বর্তমান তাকেই মাথা পেতে মেনে নেওয়া, তাকে বদল করবার বা উচ্ছেদ করবার আয়োজনে যোগ না দেওয়া। অর্থাৎ, রাজনীতি সম্বন্ধে নিরপেক্ষ হবার প্রসঙ্গটা শেষ পর্যন্ত বর্তমান শাসক-সম্প্রদায়ের রাজনীতিটাকে মাথা পেতে স্বীকার করে নেবার নির্দেশই। মেনে নিতে যদি আপনি অস্বীকার করেন, তাহলে ফ্রয়েডপন্থী এই অস্বীকারকে আপনার শৈশবের অন্ধ পিতৃদ্রোহের বিকাশ বলে বর্ণনা করবেন। তাই, দেশটাকে যে রাজনৈতিক দল যেমনভাবেই শাসন করুক না কেন, আপনি শুধু সে-সম্বন্ধে উদাসীন থাকুন, তাদের দিন চালাও সুযোগ।

তার মানে, রাজনীতি সম্বন্ধে আপাত-নিরপেক্ষতাটুকু নির্দিষ্ট এক রাজনৈতিক শাসনকে স্বীকার করে নেবার উমেদারি ছাড়া আর কী? দেশের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণটা তো আর ফ্রয়েডীয় ভাষায় মানসিক যাথার্থ্য (psychical reality) নয়, এক অতি বড়ো বাস্তব যাথার্থ্য—ফ্রয়েডের ভাষায় material reality। ভূতের ভয়ের মতো শুধুমাত্র মানসিকভাবে যদি যথার্থ হতো তাহলে না হয় মনস্তত্ত্বমূলক কোনো পদ্ধতিতে তার সঙ্গে বুঝবার অন্তত আশ্বাসটুকুও পাওয়া যেতো। কিন্তু বাস্তব যাথার্থ্য সম্বন্ধে অপক্ষপাতী হবার একমাত্র তাৎপর্য হলো তাকে স্বীকার করে নেওয়া, বড় জোর এই স্বীকৃতির দুর্ভোগকে ভুলে থাকবার একটু-আধটু আয়োজন করা।

সদরদোর দিয়ে রাজনৈতিক উৎসাহ-মাত্রকে নির্বাসন দেবার যে-আয়োজন তারই বাস্তব পরিণতি হলো খিড়কিদোর দিয়ে বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার সমর্থনকে গোপন আমন্ত্রণ পাঠানো। তার মানে, রাজনীতি বিষয়ে এই নিরুৎসাহ-প্রচারটা আসলে এক সুনির্দিষ্ট রাজনীতির পক্ষে উৎসাহ-প্রচারেরই পরিণতি। প্রসঙ্গত বলা যায়, আজকের দিনে মতবাদগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে অনুরূপ দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়। বুর্জোয়া শ্রেণীর পোষকতা-পরিপুষ্ট দার্শনিকেরা বুর্জোয়া-দর্শনেরই অনিবার্য প্রচারক, তবুও প্রচারকাজের কায়দা-কানুনটা আজ অভিনব। বুর্জোয়া জীবনাদর্শকে গ্রহণ করবার কথাটা তাঁরা আর জোর গলায় বলছেন না, তার বদলে বলছেন সংশয়বাদের কথা: মানুষের সত্যান্বেষণ নিষ্ফলতায় পর্যবসিত, জীবনের কোনো রকম মূল্য নির্ণয় করতে যাওয়াটাই আত্মপ্রবঞ্চনার নামান্তর। হালের তথাকথিত 'পসোটিভিস্ট' থেকে শুরু করে 'এক্‌সিস্‌টেন্‌সিয়ালিস্ট' দর্শন পর্যন্ত সর্বত্রই এই কথা। যুক্তিতর্কের এতো রকম আর এতো

সংকীর্ণ সব অলিগলি ঘুরিয়ে পাঠক-সাধারণকে এক অর্থহীনতার মুখোমুখি নিয়ে যাবার এমন কায়দা, সহজবুদ্ধিকে বিপর্যস্ত করবার এমন অপরূপ আয়োজন, যে দেখে তাক লেগে যায়। এতো মার্জিত, এমন সূক্ষ্ম, এমন নির্লিপ্ত যুক্তিতর্কের পেছনে যে কোনো রকম স্থূল শ্রেণীস্বার্থ লুকোনো থাকতে পারে তা সন্দেহ করতে যাওয়াই যেন সন্দেহ-বাতিকের পরিচয়। অথচ, শ্রেণীস্বার্থ একটা রয়েছেই—যদিও প্রকটভাবে নয়, প্রচ্ছন্নভাবে। এবং এই শ্রেণীস্বার্থকে দেখতে না পাওয়া অন্ধতারই প্রমাণ। কেননা, আজকের দিনে বাস্তব পরিস্থিতিটা ঠিক কী রকম তা একবার ভেবে দেখুন। বুর্জোয়া শাসনের কৃপায় বুর্জোয়া জীবন-দর্শন আজকের আকাশে বাতাসে মিশে রয়েছে; ইস্কুল-কলেজ থেকে শুরু করে ছাপাখানা-সিনেমা রেডিও পর্যন্ত সবকিছুর মাধ্যমে এই দর্শনকে প্রচার করবার প্রকট বা প্রচ্ছন্ন আয়োজন। এ-হেন পরিস্থিতিতে আপনাকে যদি বুঝিয়ে দেওয়া যায় দার্শনিক প্রচেষ্টাটুকু পণ্ডশ্রমেরই নামান্তর-মাত্র তাহলে কি ওই বুর্জোয়া দর্শন আরো নিষ্কণ্টক, আরো নিরাপদ হবার সুযোগ পাবে না? আপনি তো হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন, দার্শনিক বিচারের চেষ্টা আর করবেন না। আর এই বিচার-বিতৃষ্ণার সুযোগে আপনার মনে আপনার পারিপার্শ্বিকে প্রচলিত জীবনদর্শনটি নিরুপদ্রবে বাসা বাঁধতে পারবে।

রাজনীতি সম্বন্ধে ফ্রয়েডপন্থীর যে-ভঙ্গি তার বাস্তব পরিণতিও এই রকমই নয় কি?

কিন্তু শুধু ওইটুকুই নয়। শুধু যে ওই রকম খিড়কিদোর দিয়ে বর্তমান শাসনব্যবস্থার সমর্থনকে গোপনে আমন্ত্রণ জানানো তাই নয়। বাস্তবভাবে দেখলে দেখা যায় যতোই দিন যাচ্ছে ততোই ফ্রয়েডপন্থীরা সোজাসুজিভাবে, স্পষ্টাস্পষ্টিভাবে, একটি নির্দিষ্ট

রাজনৈতিক মতবাদের সঙ্গে নিজেদের সংযুক্ত করছেন। ফ্রয়েডীয় মতবাদের মূল কথাগুলি আলোচনা করলে দেখতে পাবো কেমনভাবে তার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির প্রচ্ছন্ন সমর্থন। কিন্তু সে-আলোচনা পরে তোলা যাবে। আপাতত দেখা যাক ফ্রয়েড এবং ফ্রয়েডপন্থীদের স্পষ্ট এবং সোজাসুজি রাজনৈতিক উক্তিগুলির কথা। এই উক্তিগুলি মোটেই রাজনীতি নিরপেক্ষতার পরিচয় নয়। তার বদলে, স্পষ্টাক্ষরে পুঁজিবাদী রাজনীতির সমর্থনমাত্র, কিংবা, যা একই কথা, মেহনতকারী জনগণের সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রচার মাত্র।

অবশ্যই মনে রাখতে হবে, বাস্তব পৃথিবীতে দিনের পর দিন পুঁজিবাদের পরমায়ু নিঃশেষ হয়ে আসছে। তার মানে, উল্টো দিক থেকে বললে বলা যায়, দিনের পর দিন সমাজতন্ত্রের শক্তি হয়ে উঠছে দুর্বার, দুর্জয়। বছর বিশেক আগেকার পৃথিবীর অবস্থার সঙ্গে আজকের পৃথিবীর অবস্থাটা তুলনা করুন, এই বাস্তব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। আর তাই, পুঁজিবাদের যাঁরা প্রচারক তাঁদের অবস্থা হয়ে উঠেছে বেপরোয়া, মরিয়া। ফলে তারই অপর পিঠে সমাজতন্ত্রের সমালোচনাটা পরিণত হচ্ছে নোংরা খিস্তি-খেউড়ে।

প্রায় বিশ বছর আগে স্বয়ং ফ্রয়েড সমাজতন্ত্র এবং মার্কস্‌বাদের যে-সমালোচনা করেছেন তার সঙ্গে আজকের দিনের 'আন্তর্জাতিক সাইকোএ্যানালিটিক্যাল সোসাইটির' সভাপতি আর্নস্‌ট্‌ জোন্‌স্‌-এর উক্তির তুলনা করুন।

প্রায় বিশ বছর আগে (১৯৩২-এ) 'জীবনের দর্শন' শীর্ষক প্রবন্ধ (৫) লেখবার সময় ফ্রয়েড বলছেন তাঁর—মনঃসমীক্ষণ বা সাইকোএ্যানালিসিসের—দার্শনিক মত (weltanschauung) আর কিছুই নয়—বৈজ্ঞানিক বিশ্বালোচনের নামান্তরমাত্র। এই

বিশ্বলোচনের সমর্থন করতে গেলে বিপরীত বিশ্বালোচনের দাবি—অর্থাৎ, বিজ্ঞান বিরোধী বিশ্বালোচনের দাবি—খণ্ডন করা দরকার। এবং আধুনিক যুগে প্রচলিত বিজ্ঞান-বিরোধী বিশ্বালোচনের দাবি বলতে ফ্রয়েড প্রধানত দুটি মতের আলোচনা তুলছেন। এক হলো, 'থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি', যা কিনা ফ্রয়েডের মতে বিজ্ঞানের ঘরে জন্মেও বিজ্ঞানকে ধ্বংস করবার কাজে এক-রকম কালাপাহাড়ী উৎসাহে মেতে উঠেছে, প্রচার করতে শুরু করেছে বাস্তব বিশ্ব সম্বন্ধে সুনিশ্চিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্ভব নয়। রাজনীতিতে নৈরাজ্যবাদের মতোই সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই 'থিয়োরি অফ রিলেটিভিটির' অনাচার! এবং বিজ্ঞান-বিরোধী দ্বিতীয় মতবাদ হিসেবে তিনি উল্লেখ করছেন মার্কস্‌বাদের। অবশ্যই বিনয়ের অভাব নেই। তিনি বলেছেন "এ-বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত জ্ঞানের যে-অভাব সে-সম্বন্ধে আমি গভীরভাবে দুঃখিত।" এবং এক আধা-অভিনন্দনের ভঙ্গিতেই স্বীকার করছেন, "মার্কস্‌বাদের আসল যেটা জোর সেটা অবশ্যই তার ইতিহাস সম্বন্ধে মতবাদ নয়, কিংবা এই মতবাদের ভিত্তিতে মার্কসবাদ যে-ভবিষ্যদ্বাণী করে তাতেও নয়; আসলে সেই জোরটা হলো, মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমনভাবে তার বুদ্ধিগত, নীতিগত এবং শিল্পগত প্রতিক্রিয়াগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে সে-বিষয়ে স্পষ্ট অন্তর্দৃষ্টি। মার্কসবাদ আবিষ্কার করলো পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং কার্যকারণ সম্বন্ধের এমন একটি গুচ্ছ যাকে ইতিপূর্বে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই অগ্রাহ্য করা হয়েছে।" (স্বাধীন তর্জমা, আক্ষরিক নয়)। কিন্তু, ফ্রয়েড বলছেন, মার্কস্‌-এর কয়েকটি বক্তব্য আমার কাছে অদ্ভুত মনে হয়, মনে হয় এগুলি বস্তুবাদী তো নয়ই, বরং কূট হেগেল-দর্শনের অবশেষমাত্র। যেমন সামাজিক গড়নের বিবর্তন প্রাকৃতিক ইতিহাসের পরিণামমাত্র, কিংবা সামাজিক

স্তরবিন্যাসের ধারা ডায়ালেক্‌টিক্‌ পদ্ধতি মেনে চলে। তাছাড়া মার্কসবাদে শ্রেণী সংগ্রামের যে-কথা তাও ভ্রান্ত। কেননা ফ্রয়েডের মতে ইতিহাসের শুরু থেকেই বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে যে-সংঘাত তারই ফলে সামাজিক শ্রেণীর জন্ম হয়েছে এবং এই সংঘাতে যে-গোষ্ঠী বিজয়ী হয়েছিলো তার সম্পদ ছিলো দুরকম। এক হলো মানসিক সম্পদ: যেমন, জন্মগত আক্রমণ-বৃত্তি। আর দুই, পার্থিব সম্পদ: যেমন ভালো অস্ত্রশস্ত্র। তাছাড়া মার্কস্‌বাদের বিরুদ্ধে ফ্রয়েডের মূল আপত্তি হলো অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের উপর জোর দিতে গিয়ে মার্কস্‌বাদ অন্যান্য বিষয়ের কথা ভুলে যায়, ভুলে যায় মনস্তত্ত্বের কথা, ঐতিহ্যের কথা। ইত্যাদি।

মার্কস্‌বাদের বাস্তব প্রয়োগ রুশ বলশেভিজম্‌-এ। ফ্রয়েড তাই বলশেভিজম্‌-আলোচনাও তুলছেন। বলছেন, বলশেভিজম্‌-এর উৎসে বিজ্ঞানের প্রেরণা, কিন্তু তার বাস্তব পরিণতি হলো বিজ্ঞানবিরোধে, ধর্মমোহে। ধর্মমোহের লক্ষণটা কী? এক হলো, স্বাধীন চিন্তার বিরুদ্ধে কড়া রকম হুকুমজারি: ইসলাম ধর্মের কাছে কোরান যে-রকম, বলশেভিকদের কাছে সেই রকমই মার্কসীয় গ্রন্থ। দুই হলো, দীনদরিদ্রের কাছে সোনালী ভবিষ্যতের আশ্বাস। ধর্মের মতোই বলশেভিজম্‌ বলে, জনগণের উপস্থিত (অর্থাৎ পূর্ণ সাম্যব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার আগে পর্যন্ত) যতো অভাব, যতো দুঃখকষ্ট, তা দুদিন পরে শেষ হবে—ইহকালের মতো পরকালে আর অপূর্ণ বাসনার তাড়না থাকবে না। তর্ক তুলে বলশেভিকরা হয়তো বলবেন, আমরা তো আর ইহলোক-পরলোকের তফাত করি নে—আমরা বলি ইহলোকেই, এই পৃথিবীতেই, জনগণের সুদিন আসন্ন হয়েছে। উত্তরে ফ্রয়েড বলছেন, এহেন কথাও নতুন কথা নয়। মনে রাখতে হবে ইহুদীদের ধর্মে পরকালের যে সোনালী ছবি তাও কোনো

পরলোকের কথা নয়—ইহলোকেই, এই পৃথিবীর বুকেই। অবশ্যই ফ্রয়েড বিনয় করে বলছেন, বলশেভিজম্-এর সব কথা তাঁর ভালো করে জানা নেই, এবং এই তথ্যাভাবের জন্যে তিনি বিশেষ দুঃখিত।

সমাজতন্ত্রের মতবাদ এবং বাস্তব প্রয়োগ—থিয়োরি এবং প্র্যাকটিস সম্বন্ধে এই হলো স্বয়ং ফ্রয়েডের সমালোচনা! নজর করলে দেখা যায় এ-সমালোচনায় নতুন কথা একটিও নেই। বুর্জোয়া মহলের পণ্ডিতেরা মার্কস্‌বাদের মধ্যে কূট হেগেল-দর্শনের ভগ্নাবশেষ থেকে শুরু করে সোভিয়েট সমাজে নব্য ধর্মমোহের অভ্যুত্থান পর্যন্ত প্রত্যেকটি কথাই বহুবার বলেছেন। এবং এই সব সমালোচনার অন্তঃসারশূন্যতা বহুবারই দেখানো হয়েছে। সাম্প্রতিক সমাজতন্ত্রবাদী গ্রন্থাবলীর সঙ্গে যাঁর কিছুটাও পরিচয় আছে তাঁর কাছে এই সব সমালোচনার প্রত্যুত্তর পুনরুক্তি-মাত্র হবে। আপাতত তাই সে-চেষ্টা করবো না। তার বদলে, ফ্রয়েডীয় সমালোচনার একটি বৈশিষ্ট্যের নজর দিতে বলবো।

কি-রকম একটা উদার দরাজ আর বিনয়ী ভাব দেখুন: মার্কস্‌বাদ তো সব একেবারে মিছে কথা নয়, এর মধ্যে কিছু কিছু সত্যি কথাও তো আছে। অবশ্যই, যে-সব কথায় বুর্জোয়া-শ্রেণীর আশু সর্বনাশ-সম্ভাবনা সেগুলির প্রতি একটুও দরাজ ভাব নয়: শ্রেণী-সংগ্রামটা ভুল, ইতিহাসের বিচারটা ভুল, আগামীকাল ইতিহাস কোন্ রূপ নেবে তার হিসেবটাও ভুল। মেজাজ যতোই উদার আর দরাজ হোক না কেন, বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে এই কথাগুলোর সংঘর্ষ যে বড়ো প্রকট। তাই মার্কসবাদের আপাত-নিরীহ কিছু দাবিকে সত্যের সম্মান দেওয়া যায়: মূল কথাগুলিকে মিথ্যা বলে বিষদাঁতটা ভেঙে দেওয়া

গেলো, তারপর ওই ভদ্দরলোক সাপটাকে কিছুটা দুধকলা খাইয়ে উদার মনোভাবের পরিচয় দেওয়া হলো।

স্বয়ং ফ্রয়েডের রচনায় এই উদার দরাজ ভাবটার দিকে বিশেষ করে নজর রাখতে বলছি, তার কারণ পুঁজিবাদের তরফের পণ্ডিতদের পক্ষে বিশ বছর আগে এমনতরো একটা ভঙ্গির অবকাশ তবু ছিলো। আজকের দিনে আর তা নেই। কেননা, প্রথম মহাযুদ্ধের পরেও বুর্জোয়াদের মনে টিঁকে যাবার যেটুকু ক্ষীণ আশা ছিলো আজ তাও শেষ হয়েছে। অপর পক্ষে, বুর্জোয়াদের চোখে সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ তখনও পর্যন্ত অল্পবিস্তর অনিশ্চিত ছিলো: কিন্তু যতোই দিন যাচ্ছে ইতিহাস ততোই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতরভাবে প্রমাণ করছে, এই অনিশ্চয়তার উপর নির্ভর করতে যাওয়াটা অলীক আত্মপ্রবঞ্চনাকে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা মাত্র। আজকের দিনে বুর্জোয়া তরফের প্রচারে তাই এমন উদার দরাজ আর বিনয়ী ভাবের বদলে বেপরোয়া আর মরিয়ার ভাব।

বিশ বছর আগের মতোই—স্বয়ং ফ্রয়েডের মতোই—আজকের দিনের ফ্রয়েডপন্থীরাও বুর্জোয়া রাজনীতিকে আঁকড়ে ধরতে চান। কিংবা, যা একই কথা, সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচারে যোগ দিতে চান। কিন্তু সেকালের ছকে বাঁধা আপাত মোলায়েম বুর্জোয়া সমালোচনাগুলির পুনরুক্তি করার মতো মনের সম্পদটুকু ফুরিয়ে গিয়েছে। তাই সোজাসুজি গালাগালির পথ! প্রায় খিস্তি-খেউড়ের পথ। সেকালের মতো আপাত-নিরপেক্ষতার ভঙ্গি কিসের সাহসে পাওয়া যাবে? তাই সোভিয়েটের মানুষদের নেহাত পাগল-ছাগল প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা, সমাজতন্ত্রের নেতাদের মনে কোন্ মনোবিকারের তাড়না তারই কল্পিত বর্ণনা দেবার চেষ্টা, এবং সমাজতন্ত্রের প্রভাব থেকে পৃথিবীকে (অর্থাৎ

বুর্জোয়াকে) বাঁচাতে গেলে কোন্ ধরনের কায়দা-কানুন অনুসরণ করতে হবে তাই নিয়ে মাথা ঘামানো।

নমুনা তোলা যাক।

বর্তমানকালে, ফ্রয়েডপন্থীদের মহাগুরু হলেন আর্নস্ট জোন্স। সম্প্রতি "আন্তর্জাতিক মানসিক স্বাস্থ্য সম্মেলনে" বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রুশ জনসাধারণের মনে এমন যে উৎকণ্ঠার জের (উৎকণ্ঠাটা সোভিয়েট জনগণের মনে, না বুর্জোয়া প্রচারকের মনে? সাইকোঅ্যানালিসিসের ভাষায় এর নাম projection নয় তো?) তার কারণ হলো, ওদের মনে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে এক পাপবোধের উৎপাত। পাপবোধটা এলো কোথা থেকে? কিসের পাপ? জোন্স বলছেন, পিতৃহত্যার মহাপাপ। ওরা ওদের ছোট্ট পিতা জারকে খুন করেছে যে!(৬)

বলাই বাহুল্য, আপাত-বৈজ্ঞানিক শব্দ-সম্ভার সত্ত্বেও এ-জাতীয় উক্তির বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব নেহাতই শূন্য। এমন কি পাল্টা প্রশ্ন করে এ-কথা তোলাও পণ্ডশ্রম যে চার্লস্‌কে হত্যা করার ফলে ইংরেজ জনসাধারণের মনে পাপবোধ আর উৎকণ্ঠার তাড়না দেখা দেয়নি কেন, কেন দেখা দেয়নি ওই পাপবোধ আর উৎকণ্ঠা ফরাসীদের মনে—তারাও তো বিপ্লবের সময় তাদের "ছোট্ট পিতা"-কে খুন করতে কসুর করেনি! মুসোলিনীকে হত্যা করবার দরুন ইতালির জনগণও কি ওই ফ্রয়েডীয় পাপবোধের বোঝায় পাগল হয়ে যাবে? পাগল হয়ে যাবে কি চীনের জনগণ চিয়াংকাইশেককে নির্বাসনে পাঠিয়ে? এ-সব প্রশ্ন তোলা সত্যিই পণ্ডশ্রম। কেননা জোন্স-এর উক্তি বিজ্ঞানের ধারকাছে ঘেঁষে না, ইতিহাস বা সমাজতত্ত্ব নিয়ে কোনো গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার পরিচায়কও নয়—খোলাখুলি রাজনৈতিক অপপ্রচার মাত্র, কেবল আপাত বৈজ্ঞানিক কিছুটা রঙ চড়িয়ে প্রচারটাকে চটকদার করবার

চেষ্টা। আর, রাজনৈতিক প্রচার হিসেবে কতোখানি খেলো, কী রকম শস্তা! ওর মধ্যে মোদ্দা কথা দুটো। প্রথমত, রুশ বিপ্লব পিতৃহত্যার মতোই মহাপাতক। আর দুই হলো, সোভিয়েটের মানুষগুলো নেহাতই যেন পাগল-ছাগল; তারা যে আজ দুনিয়ার মেহনতকারী মানুষকে অত্যাচারের বিরুদ্ধে, যুদ্ধ-চক্রান্তের বিরুদ্ধে আগুয়ান হবার নেতৃত্ব দিচ্ছে তার আসল কারণ, তাদের মনের কোণায় মনোবিকারের তাড়না।

নিজের প্রিয়তম শিষ্যকে এমন খোলাখুলিভাবে একটা বিশেষ রাজনীতি নিয়ে কোমর বাঁধতে দেখলে স্বয়ং ফ্রয়েড হয়তো লজ্জিতই হতেন; তার কারণ এই নয় যে ফ্রয়েড নিজে এই রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করেননি। তার কারণ হলো এই যে, ফ্রয়েডের সময় দিনকাল এমন 'খারাপ' হয়ে পড়েনি। তখনও পর্যন্ত একটা উদার, দরাজ ভাব, একটা মোলায়েম আপাত-নিরপেক্ষ মুখোশ পরা সম্ভব হতো—ওই নির্দিষ্ট রাজনীতির প্রচারক হওয়া সত্ত্বেও সম্ভব হতো। আজকের দিনে তা আর চলছে না। এ-কথায় তো কোনো সন্দেহ নেই যে জোন্স-ই আজকের দিনে সবচেয়ে প্রবীণ এবং সবচেয়ে সৌম্য-শান্ত ফ্রয়েডপন্থী। তাঁরই এই দশা।

তাঁরই যখন এই দশা তখন ছোটোখাটো ফ্রয়েডপন্থীদের রাজনৈতিক তাণ্ডব যে অনেক বেশি বীভৎস হয়ে দাঁড়াবে তাতে আর সন্দেহের অবকাশ কোথায়? এই তাণ্ডবের লীলাভূমি আজ মার্কিন মুলুকে। ফ্রয়েডপন্থীদের পক্ষে এতো পত্রিকা প্রকাশ করবার, এতো বই লেখবার ধুম কোথাও নেই। সেই সব পত্রিকার পাতাগুলি উল্টে যান, উল্টে দেখুন বইগুলির আলোচ্য বিষয়। দেখবেন, কোনো অজ্ঞাতকুলশীল ফ্রয়েডপন্থী হয়তো মলটভ-এর মানসিক রোগটা নির্ণয় করবার চেষ্টা করছেন, কেউ বা স্টালিনের।

পৃথিবীর বুক থেকে সাম্যবাদের উপদ্রব কেমন করে দূর করা যায় তার আলোচনাও কম নয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজ যুদ্ধ না বাধিয়ে টিকতে পারে না, তাই ফ্রয়েডপন্থীদের লেখায় যুদ্ধবাদের প্রচার। মনে রাখতে হবে, সাম্প্রতিক ফ্রয়েডবাদের আজ প্রথম ও মূল আলোচ্য বিষয় হলো মানবমনের জিঘাংসা (aggression)। এই জিঘাংসাই নাকি মানুষের সবচেয়ে প্রাথমিক সহজবৃত্তি। (৭)

তর্ক তুলে কেউ হয়তো বলবেন, যদিই বা মেনে নেওয়া যায় আজকের দিনে মার্কিন মুলুকে রাজনৈতিক উৎসাহে ফ্রয়েডবাদের ব্যবহারটা খুব বেড়েছে, তাহলেই তো সেটা ফ্রয়েডবাদের কোনো নিজস্ব দোষ হবে না। যুদ্ধবাদীরা আণবিক বিজ্ঞানকে যুদ্ধের কাজে নিয়োগ করতে চাইছে, কিন্তু অপরাধটা কি আণবিক বিজ্ঞানের? পূর্বপক্ষ হয়তো বলবেন, ফ্রয়েডবাদ একটা বৈজ্ঞানিক মতবাদ মাত্র; সেটা ভুল হতে পারে, ভুল না হতেও পারে। কিন্তু তার প্রয়োগ-অপ্রয়োগের কথাটা একেবারেই স্বতন্ত্র। সে-কথা তুলে এই মতবাদকে সমালোচনা করতে যাওয়া বৈজ্ঞানিক মেজাজের পরিচয় নয়।

উত্তরে বলবো, এ-তুলনাটা ঠিক হলো না। কেননা ফ্রয়েডবাদের নিজস্ব ধর্মই এমন যে ওই নির্দিষ্ট রাজনীতির সঙ্গে তার নাড়ির যোগ। এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা, এমন সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছানো, যে এই নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবহারের জন্যে তৈরি জমি যেন। তার মানে ফ্রয়েডবাদ এবং ফ্রয়েডবাদের রাজনৈতিক প্রয়োগকে আলাদা করা যায় না, যেমন হয়তো আণবিক বিজ্ঞানের বেলায় অন্তত চেষ্টা করা যেতে পারে। অবশ্য এই কথা স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন করবার জন্যে ভবিষ্যতে ফ্রয়েডবাদের মূলসূত্রগুলির আলোচনা তোলা দরকার হবে।

কিন্তু আপাতত যে-আলোচনা হচ্ছিলো: রাজনৈতিক উৎসাহের বিরুদ্ধে যুক্তি নিয়ে আলোচনা। উত্তরে স্বপক্ষ-দোষের কথা তুলেছি: ফ্রয়েডবাদের নিজস্ব রাজনৈতিক উৎসাহ। এই উৎসাহের প্রকাশ দুদিক থেকেই। ব্যঞ্জনার দিক থেকে এবং সোজাসুজি রাজনৈতিক পক্ষপাতের দিক থেকে। কেবল, রাজনীতিটা একটা নির্দিষ্ট রাজনীতি—বুর্জোয়া রাজনীতি—এই যা বৈশিষ্ট্য।

আমাদের দেশে চলতি কথায় বলে: পাঁচ কড়ায় গণ্ডা গুনছিস কেন? না, আমি যে ন্যাকা। তিন কড়ায় গোন না! —না, আমার যে কম হবে!

ইতিপূর্বে মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অনেকে ফ্রয়েডবাদের সমালোচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। এইসব সমালোচনা-প্রয়াসের মধ্যে কতকগুলি ব্যর্থ হয়েছে। যেগুলি ব্যর্থ হয়েছে সেগুলি প্রধানত দুরকমের। এই হলো, ফ্রয়েডবাদের সঙ্গে সম্যক পরিচয়ের অভাবটা সমালোচকেরা অন্ধ আবেগ-উত্তেজনা দিয়ে ভরাবার চেষ্টা করেছেন। ফলে, শেষ পর্যন্ত সমালোচকদের মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ ব্যাহত হয়েছে, কেননা মার্কস্‌বাদ অন্ধ আবেগ-উত্তেজনার সঙ্গে আপস করতে নারাজ। আবার অপর পক্ষে, কোনো কোনো সমালোচকের মনে ফ্রয়েডবাদের প্রতি মোহপ্রবণতা এমনই প্রবল যে তাঁদের সমালোচনা-প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ফ্রয়েডবাদের মধ্যে মার্কসীয় দর্শনের কয়েকটি মূলসূত্র আবিষ্কারের চেষ্টায় পর্যবসিত। (৮) যেন মেহনতকারী জনতার সভায় মার্কস্‌বাদের মুকুট পরিয়ে ফ্রয়েডবাদের নব্য অভিষেক! শেষ পর্যন্ত উভয় ভ্রান্তিই প্রতিক্রিয়ার সহায়ক: ফ্রয়েডপন্থী প্রথম ভ্রান্তির নমুনা তুলে মার্কসীয় সমালোচনা-মাত্রকেই হেয় প্রতিপন্ন করবার সুযোগ পান, দ্বিতীয় ভ্রান্তির দিকে চেয়ে সুনিশ্চিত সাহস পেতে পারেন। অবশ্য বলাই বাহুল্য, মারাত্মক ফলাফলের দিক থেকে দ্বিতীয় ভ্রান্তিটি সম্বন্ধে আজকের দিনে অনেক বেশি সজাগ থাকা দরকার। কেননা, আজ মার্কিন দেশের শাসক-মহল থেকে সাম্রাজ্যবাদের সমর্থন-প্রয়াসে ফ্রয়েডবাদ প্রচার করবার বহু আয়োজন, তার উপর আজ যদি কোনো কোনো সমালোচক

প্রমাণ করতে চান যে ফ্রয়েড নিজে পাকাপোক্ত ডায়ালেক্‌টিক্যাল মেটিরিয়ালিস্ট-ই ছিলেন তাহলে সংগ্রামী জনতার মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে সাম্রাজ্যবাদের ওই প্রচার-প্রচেষ্টাকেই জোরদার সাহায্য করা হবে।

মনে রাখা দরকার, ফ্রয়েড মাত্র এক-আধখানা বই লেখেননি, অজস্র বই লিখেছেন এবং অতো অজস্র লেখার মধ্যে থেকে খণ্ড, বিক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি সংগ্রহ করে তাঁকে প্রায় যে-কোনো রকম মতাবলম্বী বলেই প্রমাণ করে দেবার ফাঁক থেকে গিয়েছে। তাই মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ফ্রয়েডবাদের সমালোচনা করবার সময় অগ্রসর হতে হবে এতো অজস্র রচনার মধ্যে থেকে ফ্রয়েডবাদের মূল প্রতিপাদ্য বেছে নিয়ে। ফ্রয়েডবাদের মার্কসীয় সমালোচনার মধ্যে যেগুলি সত্যিই সার্থক সেগুলির পিছনে এই প্রচেষ্টাই। (৯) কিন্তু এখানেও একটা অসুবিধের দিক আছে। ফ্রয়েডের মূল কথা নিয়ে আলোচনা করবার সময় সাধারণত ঝোঁকটা পড়ে ফ্রয়েডের সিদ্ধান্তগুলিকে যাচাই করবার দিকে। অর্থাৎ ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলকে মার্কস্‌বাদের দিক থেকে সম্যকভাবে বিচার করবার উপর ঝোঁকটা তেমন পড়ে না। অবশ্যই এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে ফ্রয়েডের সিদ্ধান্তগুলিকে যাচাই করাটা সমালোচকের একটি প্রধান দায়িত্ব হবে! কিন্তু ঝোঁকটা যদি শুধুই এই দিকে থাকে, অর্থাৎ ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলকে উপযুক্তভাবে বিচার না করে যদি শুধু তাঁর সিদ্ধান্তগুলিকেই বিচার করবার উৎসাহে সমালোচনা করা হয়, তাহলে সে-সমালোচনা পূর্ণাঙ্গ মার্কস্‌পন্থী হতে পারে না। তাছাড়া ফ্রয়েডপন্থীর দিক থেকে এই সমালোচনাকে তুচ্ছ করবার অজুহাতও থেকে যায়। পূর্ণাঙ্গ মার্কসবাদী সমালোচনা হতে পারে না, কেননা মার্কস্‌বাদ প্রয়োগ-মতবাদের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে

আস্থাবান। তাই প্রয়োগের দিকটুকু বাদ দিয়ে, শুধু মতবাদের উপর নজর রেখে যে-সমালোচনা তা মার্কস্‌পন্থী হবে কেমন করে? ফলে ফ্রয়েডবাদের সমালোচনা-প্রসঙ্গে শুধুই ফ্রয়েডীয় থিয়োরীর আলোচনা পর্যাপ্ত নয়, সেই সঙ্গেই ফ্রয়েডীয় প্রাক্‌টিসের আলোচনাও হওয়া দরকার। অর্থাৎ সমালোচনা হওয়া দরকার ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলেরও। তাছাড়া মার্কস্‌বাদ বিচ্যুতির সম্ভাবনা ছাড়াও, কলাকৌশলের উপর উপযুক্ত ঝোঁক বাদ দিয়ে ফ্রয়েডবাদের সমালোচনা-প্রচেষ্টায় একটা মস্ত বড়ো ফাঁক থেকে যায়। কেননা ফ্রয়েড নিজে বার বার জোর দিয়ে বলছেন, কলাকৌশলটাই তাঁর আসল কথা, সাইকোঅ্যানালিসিস্‌ বলতে প্রধানত ওই কলাকৌশলই বোঝা উচিত—যদিও প্রায় একটা নিয়তির দরুনই সাইকোঅ্যানালিসিস্‌ বলতে শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে একটা পুরোপুরি মতবাদ। (১০) আর আজকের দিনে ফ্রয়েডপন্থীরা বলছেন, তাঁদের সকলের সঙ্গে সকলের মতের মিল নেই, অনেক বিষয়েই পরস্পরের মধ্যে বিরোধ। সাইকোঅ্যানালিসিস্‌ বলতে তাই কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তকে না বুঝিয়ে বরং ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলটুকুকেই বোঝা উচিত; কলাকৌশলকে সম্যকভাবে বিচার না করে ফ্রয়েডবাদের সমালোচনা করলে তা পাঠকসাধারণের কাছেও শেষ পর্যন্ত এক রকম হেঁয়ালি হয়ে থাকবার ভয়। কেননা, ফ্রয়েডপন্থীদের প্রচার-প্রচেষ্টাতেই সাধারণের ধারণায় ফ্রয়েডের এই কলাকৌশল সম্বন্ধে একটা রহস্য সৃষ্টি করবার দিকে ঝোঁক আছে—সমস্ত ব্যাপারটাই তো ঘটে বন্ধ ঘরের মধ্যে, সাধারণের চোখের আড়ালে। আর শোনা যায়, সাইকোঅ্যানালিস্ট কোনো এক আশ্চর্য কৌশলে ওই বন্ধ ঘরটির মধ্যে মানুষের মনের গোপন-গভীর রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে পারেন। তাছাড়া, চিকিৎসা-বিজ্ঞানের

সাক্ষ্য তো সত্যিই উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তাই আপনার বিচার-বিশ্লেষণে ফ্রয়েডবাদ প্রগতি-মূলকই হোক আর প্রতিক্রিয়া-মূলকই হোক পাঠক-সাধারণ নিশ্চয়ই প্রশ্ন তুলবেন: ফ্রয়েডীয় পদ্ধতির প্রয়োগে রোগী সত্যিই মনোবিকারের লক্ষণ থেকে মুক্তি পায় কিনা? যদি সত্যিই পায় এবং মার্কস্‌বাদ যদি সত্যিই বিজ্ঞান হয়, তাহলে মার্কস্‌বাদের তরফ থেকে সাইকোঅ্যানালিসিস্‌কে খণ্ডন করবার চেষ্টা কেন? কোনো কোনো মার্কস্‌পন্থী সমালোচক তাই দুটো কথাকে আলাদা করে নিতে চান। বলতে চান, ফ্রয়েডবাদের মধ্যে যেটা কলাকৌশলের দিক আসলে সেই দিকটা নিয়ে আমাদের সমালোচনা নয়। সমালোচনাটা বিশেষ করে ফ্রয়েডীয় সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে, ফ্রয়েডের দার্শনিক মতবাদটা নিয়ে, সমাজতত্ত্ব আর রাজনীতির ক্ষেত্রে এই মতবাদের উপসিদ্ধান্তগুলি নিয়ে। এই রকম চেষ্টার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো, কড্‌ওয়েলের রচনা। (১১) কড্‌ওয়েল বলতে চান, ফ্রয়েড আসলে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক তথ্যের সন্ধান পেয়েছিলেন, কিন্তু সেগুলি থেকে যখন তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে পৌঁছবার চেষ্টা করলেন তখন দেখা গেলো বিজ্ঞান ছেড়ে তিনি পৌরাণিক কল্পনায় বিভোর হয়ে পড়েছেন।

কিন্তু ফ্রয়েড-প্রসঙ্গে এই রকমের একটা ভঙ্গি নেওয়াও ঠিক হবে না। এটা নিভুল মার্কসীয় ভঙ্গি হবে না, কেননা এই ভঙ্গির পিছনে মতবাদ আর প্রয়োগের মধ্যে অলীক পার্থক্য-কল্পনা। তাছাড়া, সাধারণের কাছে এটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবে। কেননা, এর ফলে ব্যাপারটা দাঁড়াবে, যেন ফ্রয়েডবাদের সদর মহলটায় অনেক রকম গোলযোগ আর ভুলচুক থাকলেও অন্দর মহলে আছে আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক ঐশ্বর্য। সে-ঐশ্বর্য সাধারণের চোখের আড়ালে, কিন্তু সে দিকে চোখ পড়লে চোখ ঝলসে যাবার

অবস্থা। অর্থাৎ এই ভঙ্গির ফলে, ফ্রয়েডবাদ সম্বন্ধে সাধারণের কাছে এই রকম রহস্য সৃষ্টিই করা হবে—ফ্রয়েডবাদের বৈজ্ঞানিক বিচারের দিকে এগুনো যাবে না। তাই কলাকৌশলের কথা বাদ দিয়ে ফ্রয়েডবাদের প্রকৃত মার্কসীয় সমালোচনা সম্ভব নয়। প্রশ্ন তুলতে হবে, ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলটা ঠিক কী রকম? প্রশ্ন তুলতে হবে, চিকিৎসা পদ্ধতি হিসেবে তার ব্যবহারিক মূল্য ঠিক কতোখানি। এবং এই সব বিষয় সম্বন্ধে মার্কসবাদীর মন্তব্য কোন্ ধরনের?

অর্থাৎ দেউড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে ফ্রয়েডবাদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা নয়। ফ্রয়েডবাদের অন্দর মহলটা তাতে এক রহস্যপুরীই হয়ে থাকবার সম্ভাবনা। তাই মার্কস্বাদীকে প্রবেশ করতে হবে ফ্রয়েডবাদের অন্তঃপুরের মধ্যে।

মার্কসবাদী যদি এইভাবে ফ্রয়েডীয় মতবাদের অন্তঃপুর পর্যন্ত অগ্রসর হন, তাহলে দেখতে পাবেন এই অন্তঃপুরের মধ্যে যা-কিছুর আয়োজন তারই উপর পুঁজিবাদী সভ্যতার, পুঁজিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির নিঃসন্দেহ স্বাক্ষর। অর্থাৎ ফ্রয়েডীয় কলাকৌশল এবং চিকিৎসা-পদ্ধতি বলে ব্যাপারও বুর্জোয়া সভ্যতার আদর্শ, আকাঙ্ক্ষা আর কায়দাকানুন বহির্ভূত নির্লিপ্ত বিজ্ঞান নামের অপরূপ আর অপূর্ব কিছু নয়।

শুরুতে ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া দরকার।

সাইকোঅ্যানালিস্ট-এর ঘরটা আধো-অন্ধকার। রোগী ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেবেন: ঘরে কোনো তৃতীয় ব্যক্তি থাকা চলবে না, খোলা ঘরে সাইকোঅ্যানালিসিস্ চলে না। রোগী একটা শোবার জায়গায় শরীরটাকে সম্পূর্ণ এলিয়ে দিয়ে চোখ বুঁজে কথা বলে যাবেন: যে-কোনো কথা মনে আসবে

তাই বলে যেতে হবে, সেগুলো যতো অবান্তর, আজগুবি, এলোমেলো বা অশ্লীল মনে হোক্ না কেন, কোনো রকম বিচার-বিশ্লেষণ করা চলবে না। এই ব্যাপারটার নাম 'অবাধ অনুষঙ্গ' বা ফ্রি এ্যাসোসিয়েশন। তারপর রোগী চোখ খুলবেন, চিকিৎসক এই সব কথার একটা ব্যাখ্যা দেবেন। রোগী সেই ব্যাখ্যা শুনে নির্দিষ্ট ফী দিয়ে পরে কোন্‌দিন কোন্ সময়ে আবার আসতে হবে তাই ঠিক করে বিদায় নেবেন। এই রকম দিনের পর দিন। তিনশো দিন—কিংবা তারও অনেক বেশি হতে পারে। ফী-র কথাটা জরুরী—ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলের একটা অঙ্গ। ফী না হলে চিকিৎসা অসম্ভব। তাছাড়া কাঁচা টাকায় ফী দিতে হবে—নোট চলবে না, চেক চলবে না। দীর্ঘ দিন ধরে চিকিৎসা। এই সময়টার মধ্যে রোগীর মনে কখনো হয়তো চিকিৎসার বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ। এর নাম রেসিস্‌টেন্‌ বা 'প্রতিবন্ধ'। কখনো আবার চিকিৎসকের প্রতি গভীর অনুরাগ, সত্যিকারের প্রেম। এর নাম ট্রান্স্‌ফারেন্স্‌ বা 'সংক্রমণ'। প্রতিবন্ধ বলে ব্যাপারটার ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা হলো: রোগী এতোদিন পর্যন্ত নিজের মনের কাছ থেকেও যে-সব কথা লুকিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছেন চিকিৎসক সেগুলি প্রকাশ করে দিচ্ছেন, তাই অমন রাগ। সংক্রমণ বলে ব্যাপারটার ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা হলো: শৈশব থেকে রোগীর মনে পিতামাতার প্রতি যে-আবেগ-অনুরাগ উপযুক্ত চরিতার্থতা না পেয়ে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে তা চিকিৎসকের প্রতি সংক্রামিত হওয়া। অবশ্য অনেক সময় প্রতিবন্ধকেও নেগেটিভ্‌ ট্রান্সফারেন্স্‌ বা নেতিমূলক সংক্রমণ বলা হয়—অর্থাৎ পিতামাতার প্রতি শৈশব আক্রোশটা চিকিৎসকের উপর গিয়ে পড়ে। যাই হোক, চিকিৎসক প্রতিদিনই রোগীর কাছে এই প্রতিবন্ধ ও সংক্রমণের প্রকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে যাবেন। আর তারপর? শেষ পর্যন্ত কী হবে?

চিকিৎসার আসল উদ্দেশ্যটা অবশ্যই রোগীর মনকে সুস্থ স্বাভাবিক করে তোলা। কিন্তু স্বাভাবিক মন বলতে ঠিক কী বোঝায়? ফ্রয়েডীয় মতে এ্যাড্জাস্টমেন্ট বা 'উপযোজন'। অর্থাৎ কিনা, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে ঠিকমতো খাপ খাওয়াতে পারা, মানিয়ে নেওয়া।

তাহলে, সংক্ষেপে, ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলের মূল কথা কী কী?

১ : বন্ধ ঘর
২ : প্রতিবন্ধ
৩ : ফী-কাঁচা টাকা
৪ : সংক্রমণ
৫ : উপযোজন
৬ : অবাধ অনুষঙ্গ

একে একে এই কটি কথা নিয়ে আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই বুর্জোয়া মতাদর্শের কী রকম নির্ভুল স্বাক্ষর!

খোলা জায়গায় সাইকোএ্যানালিসিস্ চলবে না। তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি এ-পদ্ধতির পরিপন্থী। তার মানে, চিকিৎসার সময় সামাজিক পটভূমিকে সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলা দরকার, সমাজ-জীবনকে একান্তভাবে পিছনে ফেলে আসা দরকার। বন্ধ ঘর: রোগীর পক্ষে নিজের হাতে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেওয়াই ভালো, কেননা তাতে সমাজ-জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবার প্রত্যক্ষ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়। চিকিৎসকও ক্রমাগতই চেষ্টা করেন রোগী যেন তাঁর ভাব-আবেগকে নিছক, নিরবলম্ব ভাব-আবেগ হিসেবে দেখবার পথে এগুতে পারেন। অর্থাৎ কিনা রোগীর চেতনাকে, রোগীর চিন্তাপদ্ধতিকে, ক্রমাগতই এমন দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা যে-দিকে কোনো রকম সামাজিক বিচার-বিশ্লেষণ নেই, কোনো রকম সমাজ সংস্কার নেই। কিন্তু সমাজ-চেতনাটুকুকে মন থেকে একেবারে মুছে ফেলা তো সহজ কথা নয়। চিকিৎসক তাই একটি কাল্পনিক উদাহরণের সাহায্য নিতে বাধ্য হন: রোগীকে ভেবে দেখতে বলেন, রবিন্‌সন্ ক্রুশোর মতো রোগী যদি কোনো নির্জন দ্বীপের একমাত্র অধিবাসী হতেন তাহলে তাঁর পক্ষে অমুক কাজ করায় বা তমুক ব্যবহার করায় সত্যিই কি কোনো বাধা থাকতো?

তার মানে ফ্রয়েডীয় পদ্ধতির প্রথম ধাপ হলো রোগীর মন থেকে সমষ্টিচেতনা বিনাশ করে নির্জলা ব্যষ্টিচেতনাকে জাগিয়ে

তোলা। রোগীর পারিপার্শ্বিকে যে সমাজ, তার আইন-কানুনে, সংস্কার-বিচারে গ্লানি আছে। সেই গ্লানিগুলি সম্বন্ধে রোগীকে সচেতন করে উন্নততর ও গ্লানিমুক্ত সামাজিক পরিকল্পনার দিকে এগিয়ে যেতে রোগীকে সাহায্য করা নয়, সেই উন্নততর আদর্শের প্রেরণায় রোগীর মনকে সঞ্জীবিত করবার চেষ্টা নয়। সেটা বাস্তবের পথ হতে পারতো, হতে পারতো প্রকৃত বিজ্ঞানের পথ—দুনিয়াকে বদল করবার পথ। কিন্তু সে পথ ফ্রয়েডীয় পদ্ধতির পথ হতে পারে না। কেননা, উপযোজন বা এ্যাড্‌জাস্টমেন্ট নিয়ে আলোচনা করবার সময় স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যাবে এ-পদ্ধতির চূড়ান্ত আদর্শ হলো বর্তমান বাস্তবটা যতই গ্লানিময় হোক না কেন, কোনোমতে রোগীর চেতনাকে তারই সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা। অর্থাৎ বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাকে রোগী যাতে বিনা দ্বন্দ্বে সহ্য করতে পারেন তারই আয়োজন। এবং রোগীর মানসিক চাহিদাকে শেষ পর্যন্ত বুর্জোয়া বাস্তবের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হবে বলেই ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলের প্রথম ধাপে বুর্জোয়া আদর্শের মূল ভ্রান্তিকে আশ্রয় করবার ব্যবস্থা। ব্যক্তির মধ্যে যেটা নিছক নিজস্ব দিক, স্বতন্ত্র দিক, ব্যষ্টির দিক, সেই দিকটুকুর উপর দৃষ্টি আবদ্ধ করতে শেখানো, সমাজকে ভুলতে শেখানো, সমষ্টিগত চেতনার সঙ্গে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে শেখানো। সমাজকে ভুলতে পারলেই—সমাজের বন্ধন ছিঁড়ে পালিয়ে যেতে পারলেই—বুঝি সমাজের গ্লানি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে! এইটেই হলো বুর্জোয়া ভাবাদর্শের মূল ভ্রান্তি, রুশোর রচনায় যে-ভ্রান্তির চরম প্রচার! রুশো বললেন, ফিরে চলো প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে, স্বাভাবিক মানুষের মতো। দাও ফিরে সে-অরণ্য, লও এ-নগর। কিন্তু মার্কস্‌বাদ নির্ভুল হিসেব করে দেখায় এইভাবে সমাজ-চেতনা

থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবার চেষ্টাটুকু আর কিছুই নয়, বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার যে-গ্লানি তারই ফাঁদে পা দেবার ওজুহাত মাত্র। অর্থাৎ সামাজিক চেতনা থেকে যতোই আপনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন করবার চেষ্টা করবেন আপনার বর্তমান সমাজ ততোই আপনাকে পেয়ে বসবে, ততোই আপনার ঘাড় ধরে এই সমাজ-ব্যবস্থা আপনাকে দিয়ে তার নিজের চাহিদা মিটিয়ে নেবে। কেননা, এই সমাজ ব্যবস্থায় রূপান্তর আনার ব্যাপারে অনিবার্যভাবেই প্রয়োজন হলো সংঘবদ্ধ হওয়া, সমষ্টির মধ্যে ব্যক্তির পক্ষে আত্মসমর্পণ। তা না হলে, বদল হবে না এই সমাজ-বাস্তবের এবং সমাজ-বাস্তবের বদল যদি না হয় তাহলে আপনি নিজের কল্পনায় যেমনভাবেই এ থেকে মুক্ত হতে চান না কেন এই সমাজ-ব্যবস্থা জোর করে তার ষোলো আনা চাহিদা আপনার কাছ থেকে আদায় করে নেবে।

তাই-সমাজ-চেতনা থেকে বিমুক্ত হবার উপদেশটুকু বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার ফাঁদে পা দেবার আমন্ত্রণই। ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলের প্রথম ধাপে এই আমন্ত্রণেরই পরিচয়: দরজা বন্ধ করে সমাজের কথাটা আড়াল দিয়ে সাইকোএ্যানালিসিস্ শুরু এবং সাইকোএ্যানালিস্ট-এর ক্রমাগত চেষ্টা হলো রোগীর মন থেকে সমষ্টি চেতনাকে লোপ করে দেবার, যাতে তার চিন্তার পদ্ধতিটা হয় রবিন্‌সন্ ক্রুশোর মতো, রুশোর ওই বুনো মানুষের মতো—নিঃসঙ্গ, একক, অতএব অসহায়, নিরুপায়: সামাজিক বাস্তবের সামনে মাথা নোয়াতে সে বাধ্য হবেই, বাধ্য হবেই সমাজের সব রকম গ্লানি মাথা পেতে মেনে নিতে। অর্থাৎ কি না ফ্রয়েডীয় পরিভাষার উপযোজন বা এ্যাড্‌জাস্টমেন্ট।

ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলের আর একটি খুব জরুরী কথা হলো প্রতিবন্ধের কথা: চিকিৎসকের বিরুদ্ধে, চিকিৎসা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে, রোগীর তরফ থেকে অনেক রকম স্থূল ও সূক্ষ্ম ওজর-আপত্তি। রোগী যেন পণ করে বসেছে, রোগমুক্তিকে যেমন করেই হোক রুখতে হবে। ফ্রয়েড বলেছেন, আপাতত অদ্ভুত মনে হলেও এর সুনির্দিষ্ট কারণ রয়েছে। প্রথমত, রোগলক্ষণ থেকে রোগী একরকম কাল্পনিক সুখ পান, রোগমুক্তি মানেই সেই সুখের সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত হবার ভয়। উপমা দিয়ে ফ্রয়েড বলেন, কোনো কোনো ভিখিরী তো হাতে ঘা পোষে: ঘা দেখিয়েই ভিক্ষে জোটে, তাই ওর ঘায়ের চিকিৎসা করতে গেলে ভিখিরী বাধা দেবে বই কি! (১২) মনোবিকার থেকেও যেন একরকম ভিক্ষে পাওয়া যায়, ফ্রয়েড তার নাম দেন রোগ-থেকে-পাওয়া মুনাফা। কেবল মনে রাখতে হবে এই মুনাফাটা রোগীর সজ্ঞানে নয়। এর খবরটা রোগী নিজেই নিজের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখেন। দ্বিতীয়ত, ফ্রয়েডের মতে এখানে আরো একটা কথা আছে। তাঁর কলাকৌশলের উদ্দেশ্য হলো রোগীর নিজের চেষ্টার একেবারে বিপরীত : রোগী নিজের কাছ থেকেও যে-কথা গোপন রাখতে চান সেই কথাই প্রকাশ করবার উদ্দেশ্য তাঁর কলাকৌশলের। তাই প্রতিবন্ধটা স্বাভাবিকই।

অবশ্যই ফ্রয়েড বলেন, এই প্রতিবন্ধের পরিচয় শুধুই চিকিৎসা-প্রসঙ্গে নয়। এর একটা বৃহত্তর সামাজিক সংস্করণ আছে।

তার মানে, সাধারণত সামাজিকভাবে ফ্রয়েডবাদের বিরুদ্ধে যে-আপত্তি তা ওই প্রতিবন্ধেরই পরিবর্ধিত বিকাশমাত্র। (১৩)

এবং, প্রতিবন্ধ নিয়ে আলোচনা করবার সময় তাঁর এই পরিবর্ধিত সামাজিক বিকাশটার বিশ্লেষণ থেকেই শুরু করার সুবিধে। কেননা, বন্ধ ঘরের আধো অন্ধকারে ব্যক্তিবিশেষের ব্যবহারের মধ্যে যে-কথাটাকে রহস্যঘন করে তোলবার সুযোগ, বৃহত্তর সামাজিক জীবনেও দিনের আলোয় তারই যে-পুনঃপ্রকাশ, তার উপর রহস্যের জাল বোনবার সুযোগ অনেক কম। অর্থাৎ আলোচনার সুযোগ-সুবিধে অনেক বেশি। তাই প্রতিবন্ধের এই সমাজ-রূপটা নিয়েই আলোচনা শুরু করা যাক।

ফ্রয়েডের মতে, তাঁর আবিষ্কারটুকুকে ভুলে থাকতে পারলেই মানবসমাজের নিশ্চিন্ত আরাম। মনোবিকারের রোগী রোগ-মুনাফা নামের যে-রকম আরাম পায় সেই রকমই। কেননা, তিনি এমন কতকগুলি কথা আবিষ্কার করেছেন বলে দাবি করেন, যা শুধুই মানবমনের আত্মাভিমানকেই পীড়িত করে না, এমন কি মানবসমাজের বনিয়াদটুকুকেও সংকটাপন্ন করে তোলে। আত্মাভিমানটা পীড়িত হবার কথা কেন? তার কারণ, ফ্রয়েড বলছেন, মানুষের চিরন্তন অভিমান হলো সচেতন কীর্তির অভিমান; অথচ তাঁর আবিষ্কার প্রতিপন্ন করছে এই সব সচেতন কীর্তির পিছনে রয়েছে কতকগুলি অন্ধ, অচেতন এবং সামাজিকভাবে নিকৃষ্ট বাসনার তাগিদ। মানুষের অভিমান এতে আহত হবে না? ফ্রয়েড বলছেন, বিজ্ঞানের ইতিহাসে মানুষের আত্মাভিমান এর আগে আর দুবার এই রকম ভাবে আহত হয়েছিল। এক, কোপার্নিকাস যখন প্রমাণ করলেন, আমাদের এই পৃথিবী সত্যিই সৌরজগতের কেন্দ্র নয়। আর দুই, ডারউইন যখন প্রমাণ করলেন, আমাদের এই প্রজাতি আসলে একরকম

বনমানুষের বংশধর। (১৪) আর, মানুষের আত্মাভিমান অমন সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছিল বলেই এই দুটি মতবাদের বিরুদ্ধেও দেখা দিয়েছিল দারুণ সামাজিক প্রতিবন্ধ!

কিন্তু ফ্রয়েডীয় মতবাদের দরুন মানবসমাজের বনিয়াদটা সংকটাপন্ন হয়ে পড়বে কেন? তার কারণ ফ্রয়েড বলেছেন, সমাজ-সভ্যতা বলে মানুষ যা-কিছুই গড়ে তুলেছে তাই তার নিজের যৌন-চরিতার্থতাকে খর্ব করে, সঙ্কুচিত করে গড়ে তোলে। যৌন তাগিদটাই যেন ইন্ধন, এই ইন্ধন জোগান দেওয়া গিয়েছে বলেই সভ্যতার বহ্নি এমন দীপ্ত কিরণে ইতিহাসকে উদ্ভাসিত করতে পেরেছে। মানুষের সভ্যতা তো এমনি গড়ে ওঠেনি, আত্মত্যাগের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়। ফ্রয়েড মনে করেন, সভ্যতা যে বিরাট আত্মত্যাগ মানুষের কাছ থেকে দাবি করে তার অনুপাতে সভ্যতার প্রতিদানটা যৎসামান্যই। (১৫) অর্থাৎ, আত্মত্যাগটা অনেকাংশে অহেতুক, অর্থহীন। আর এই কথাটা মানুষ যদি স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে শেখে তাহলে সভ্যতার বনিয়াদটুকু কেঁপে উঠবে না কি? সভ্যতার তরফ থেকে এই মতবাদের বিরুদ্ধে অভিযানটা তাই।

অবশ্যই, ফ্রয়েডের মতে মানুষের আত্মাভিমান আর সমাজ-সভ্যতা সব কিছুই ইতিহাস-উত্তীর্ণ শাশ্বত ও সনাতন ব্যাপার। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে এর ইতরবিশেষে যদিই বা কোনো তফাত দেখা দেয় তা হলেও সে-তফাত মৌলিক নয়। অর্থাৎ বাইরের দিকে এই রদবদল যাই হোক না কেন ভিতরের চেহারাটা বরাবর একই রকম। তার মানে ফ্রয়েডের চেতনায় ইতিহাসবোধ -এর স্থান নেই।

এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, ফ্রয়েড যখন প্রথম তাঁর মতবাদ পেশ করেন তখন এই মতবাদের বিরুদ্ধে তীব্র সামাজিক

নিন্দা ও আন্দোলন দেখা দিয়েছিলো। বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে অনেকদিন ধরে অনেকভাবে তাঁকে যুঝতে হয়েছে। (১৬) কিন্তু তার আসল কারণ যদি এই হতো যে তাঁর মতবাদ মানুষের আত্মাভিমান আহত করেছে, সংকটাপন্ন করে তুলেছে সভ্যতার বনিয়াদ, তাহলে হঠাৎ আজকের দিনে ব্যাপারটা এমন আশ্চর্যভাবে বদলে গেলো কেন? ইংরেজ এবং বিশেষ করে মার্কিন মুলুকের কথা ভেবে দেখুন: সাইকোএ্যানালিসিস্ নিয়ে কী প্রবল প্রচণ্ড উৎসাহ! কী অজস্র অর্থব্যয়। গল্প-উপন্যাস, দৈনিক-সাপ্তাহিক থেকে শুরু করে সিনেমা-টেলিভিশন পর্যন্ত আধুনিক জগতের যতো রকম প্রচার-মাধ্যম আছে তার সাহায্যে সাইকোএ্যানাসিলিসের প্রচণ্ড প্রচার। (১৭) এই প্রচার-ব্যবস্থার পরিচয় খুঁটিয়ে দিতে গেলে অনেকখানি জায়গা যাবে। আধুনিক মার্কিন সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে যাঁর সামান্যতম পরিচয়ও আছে তিনিই জানেন আজকের দিনে ওদেশে সাইকোএ্যানালিসিস্ নিয়ে কী ধুমধাম। ফ্রয়েড তাঁর জীবদ্দশায় একবার আক্ষেপ করে বলেছিলেন, আধুনিক সভ্যজীবন মানুষের উপর অসহ্য বোঝা চাপিয়েছে। এ-সম্বন্ধে একটা সংশোধন-ব্যবস্থার প্রয়োজন, এবং হয়তো কোনো একদিন সত্যিই কোনো কোটিপতি মার্কিন দাতা কোটি কোটি টাকা দান করে সমাজ-কর্মীর দলকে সাইকোএ্যানালিটিক্যাল্ কলাকৌশলে দীক্ষিত করে তুলবেন, আধুনিক জীবন যে-বিকারগ্রস্ত অবস্থা সৃষ্টি করেছে, তার সঙ্গে এঁরা সঙ্কটত্রাণ ফৌজের মতো লড়াই করতে পারবেন। (১৮) আজকের দিনে ফ্রয়েড যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনি নিশ্চিতই দেখতে পেতেন কোনো নির্দিষ্ট মার্কিন দাতা-মহারাজের প্রত্যক্ষ দান হিসেবে না হলেও মার্কিন মুল্লুকে সত্যিই সাইকোএ্যানালিসিসের পিছনে কোটি কোটি টাকা খরচ করবার

আয়োজন। রাজনীতির ঘোরপ্যাঁচ কিন্তু এমনই পরিহাস-রসিক যে এই উৎসাহের উদ্দেশ্যটা আধুনিক জীবনের গ্লানিকে হালকা করা নয়, আধুনিক সমাজ ব্যবস্থাকে----অতএব এই গ্লানিকেই—টিকিয়ে রাখবার ব্যর্থ প্রয়াস।

তাহলে ফ্রয়েড যে ব্যাপারটাকে সাইকোএ্যানালিসিসের বিরুদ্ধে মূল প্রতিবন্ধের বৃহৎ সামাজিক বিকাশ বলে বর্ণনা করছেন সেইটের কী হলো? সত্যিই কি কোনো রকম আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ ওই প্রতিবন্ধটার জাত-বদল করে ওকে অবৈধ উৎসাহে পরিণত করেছে? কিন্তু তা তো আর বাস্তবিক সম্ভব নয়। যে-মতবাদ ফ্রয়েডের মতে মানুষের আত্মাভিমানকে নির্মমভাবে আহত করে, আজকের ক্ষয়িষ্ণু পৃথিবীতে সেই মতবাদই মানুষের কাছে এমন প্রিয় হয়ে উঠলো কী করে? যে-মতবাদ ফ্রয়েডের মতে সমাজের বনিয়াদটাকেই সংকটাপন্ন করে তোলে, সেই মতবাদকেই আজকের ক্ষয়িষ্ণু সমাজ অমন মরিয়ার মতো আঁকড়ে ধরছে কেন? ফ্রয়েডবাদ নিয়ে এই সাম্প্রতিক উৎসাহটুকু থেকেই প্রমাণ হয় প্রতিবন্ধ-সংক্রান্ত ফ্রয়েডীয় মতবাদটার গোড়ায় গলদ রয়েছে। তার মানে সাইকোএ্যানালিসিসের বিরুদ্ধে অতীত আপত্তিটার ফ্রয়েড যে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন সেই ব্যাখ্যার বৈজ্ঞানিক মর্যাদা নেই। মানুষের সনাতন আত্মাভিমান আহত হবার কথা, কিংবা সভ্যতার বনিয়াদ সংকটাপন্ন হবার কথা—কানে শুনতে যতই রোমাঞ্চকর লাগুক না কেন, এগুলো তাঁর প্রখর কল্পনাশক্তিরই পরিচয়, বৈজ্ঞানিক উপসংহার নয়।

তার মানে কি এই যে সমাজের তরফ থেকে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিরুদ্ধে বাধা ওঠবার কথাটাই কল্পনা? সামাজিক প্রতিবন্ধ বলে ব্যাপারটাই কি মিথ্যে? নিশ্চয়ই নয়, যদিও সমাজ বলতে একটা সনাতন ও অন্তর্দ্বন্দ্বহীন কিছু বুঝতে গেলে এই

সামাজিক প্রতিবন্ধের কথাটা আগাগোড়াই কাল্পনিক হয়ে দাঁড়ায়। কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, ডারউইন, মার্কস্—এঁদের সবাইকার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিরুদ্ধেই সামাজিকভাবে তীব্র ও তুমুল আপত্তি উঠেছে। বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বিরুদ্ধে সামাজিকভাবে মাঝে মাঝে দারুণ বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে বই কি। কিন্তু এই বিক্ষোভের উৎসটা ঠিক কোথায়? পুরো সমাজটা? নিশ্চয়ই নয়। মানুষের সনাতন আত্মাভিমান? তাও নয়। তাহলে?

আসলে মার্কস্‌পন্থী বিচার করে দেখান, কোনো একটা বিশেষ সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখবার ব্যাপারে যে-শ্রেণীর স্বার্থ সেই শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে কোনো বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার বা দার্শনিক মতবাদ যখন সংঘাত সৃষ্টি করে, তখনই কায়েমী স্বার্থের খাতিরে ওই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের বা দার্শনিক মতবাদের বিরুদ্ধে সমাজে তীব্র সোরগোল সৃষ্টি হয়। এই কথার মূল তাৎপর্যগুলি একে একে দেখা যাক। প্রথমত, সমাজ-ব্যবস্থা বলে ব্যাপারটা সনাতন বা শাশ্বত কিছু নয়। যুগে যুগে মানব-সমাজে মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেয়। দ্বিতীয়ত, পুরো সমাজটাকে অন্তর্দ্বন্দ্বহীন সমজাতীয় কোনো কিছু বলে কল্পনা করা চলে না। সভ্য সমাজ শুরু হবার মুখোমুখি সময় থেকে ধনতন্ত্রের চূড়ান্ত বিকাশ পর্যন্ত সমস্ত সমাজ ব্যবস্থার মূলেই অন্তর্দ্বন্দ্ব। সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের নাম শ্রেণীসংগ্রাম—শোষক আর শোষিতের মধ্যে সংগ্রাম, শাসক আর শাসিতের মধ্যে সংগ্রাম। তৃতীয়ত, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও দার্শনিক মতবাদ বলে ব্যাপারগুলি বিশুদ্ধ, নির্লিপ্ত ও নৈর্ব্যক্তিক কিছু নয়, শ্রেণীসংগ্রামের সঙ্গে এগুলির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। অর্থাৎ কোনো আবিষ্কার বা মতবাদ একটা বিশেষ সমাজের শোষক-শাসক শ্রেণীর স্বপক্ষেও যেতে পারে আবার বিপক্ষেও

যেতে পারে। আর চতুর্থত, যে-মতবাদ বা যে-আবিষ্কার সামাজিকভাবে যে-শ্রেণীর স্বার্থে আসে সেই শ্রেণী ওই মতবাদকে সমর্থন করে, যে-শ্রেণীর বিরুদ্ধে যায় সেই শ্রেণী এর বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টি করে।

তাঁর নিজের তরফের দৃষ্টান্ত হিসাবে ফ্রয়েড উল্লেখ করেছেন, কোপার্নিকাস আর ডারউইনের কথা। চমৎকার দৃষ্টান্ত, সন্দেহ নেই। কিন্তু কথা হলো, দৃষ্টান্ত দুটির তাৎপর্য কি সত্যিই তাঁর মতবাদের তরফে যায়? নমুনা দুটিকে বিশ্লেষণ করা যাক। কোপার্নিকাসের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি। কিন্তু কোন্ সমাজের, কোন্ শ্রেণীর তরফ থেকে আপত্তি? কেন আপত্তি? য়ুরোপের সামন্ত যুগটার শেষাশেষি যে-অবস্থা তার পটভূমি মনে না রাখলে এ-আপত্তির তাৎপর্য বোঝা সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে, তখনকার দিনে জমিদার আর পাদ্রী শ্রেণীর কথা। তারাই শোষক, তারাই শাসক আর তাদের শাসনের একটা খুব মোক্ষম অস্ত্র হলো ধর্মমোহ। সেই ধর্মমোহের বিরুদ্ধে তীব্র আঘাত হানলো কোপার্নিকাসের আবিষ্কার। সামন্তযুগের শোষকশ্রেণী খাপ্পা হয়ে উঠবে না কেন? কিন্তু সমাজ বদলালো, শেষ হলো জমিদার-পাদ্রীদের শোষণ-শাসন আর সেই সঙ্গে শেষ হলো কোপার্নিকাসের বিরুদ্ধে ওই তীব্র বিদ্বেষ-প্রচার। কেননা, নতুন যে-শ্রেণী প্রভুর আসনে বসলো তার স্বার্থের সঙ্গে কোপার্নিকাসের ওই আবিষ্কারের অমন সংঘর্ষ নেই। তাই নেই বিদ্বেষ প্রচারের অমন উৎসাহ। মানবাত্মার সনাতন অভিমান যদি ক্ষুণ্ণ করে থাকে, তাহলে আজকের দিনে কোপার্নিকাসের আবিষ্কার আমার আপনার সহজ বুদ্ধিতে পরিণত হলো কী করে? আমাদের এই পৃথিবী যে সত্যিই সৌরজগতের কেন্দ্র নয় সূর্যের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে—এ কথায় আমাদের ইজ্জত খোয়া যাবার কোনো

সম্ভাবনা কল্পনা করাই আমাদের পক্ষে আজ রীতিমত কঠিন। কিন্তু তখনকার দিনের ধর্মমোহের সঙ্গে এ-কথার যে কী দারুণ সংঘর্ষ তা সামান্যমাত্র ঐতিহাসিক চেতনার বলে আমাদের পক্ষে আন্দাজ করা একটুও কঠিন নয়। ডারউইনের বেলাতেও একই কথা। কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে তাঁর আবিষ্কারের যতখানি বিরোধ, কায়েমী স্বার্থে সামাজিকভাবে তাঁর আবিষ্কারের বিরুদ্ধে ঠিক ততখানিই কুৎসা-প্রচার করেছে। ডারউইনের বিরুদ্ধেও সবচেয়ে প্রবল আপত্তি রক্ষণশীল শ্রেণীর তরফ থেকে, কেননা ডারউইনের আবিষ্কার এই রক্ষণশীল স্বার্থে আঘাত হেনেছে। সৃষ্টিতত্ত্বের সনাতন এক উপাখ্যানের সঙ্গে রক্ষণশীল শ্রেণীর স্বার্থ প্রকটভাবে সংযুক্ত। তাছাড়া ডারউইনের ব্যাপারে আরও একটা কথা বিশেষ করে লক্ষ্য করা দরকার। তাঁর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে মিশেল হয়ে রয়েছে পুঁজিবাদী নীতিকথার বিজ্ঞানম্মন্য নির্লজ্জ প্রচারক ম্যাল্‌থাসের মতবাদ—তথাকথিত জ্ঞানের খাতিরে আত্মীয়বোধের নীতি। এবং পুঁজিবাদী সভ্যতার পরমায়ু যতই ফুরিয়ে আসছে ততোই পুঁজিবাদী দুনিয়ায় ডারউইনের আসল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারটুকুর উপর থেকে ঝোঁক সরিয়ে (কেননা এ-আবিষ্কার শেষ পর্যন্ত পুঁজিপতিদের কায়েমী স্বার্থকেও সম্মান করতে পারে না।) ওই অবৈজ্ঞানিক কল্পনার উপরই ঝোঁক দেবার চেষ্টা। ডারউইনের আবিষ্কার সম্বন্ধে এবং আধুনিক সমাজে ডারউইনের সমালোচনা সম্বন্ধে গ্রন্থান্তরে থেকে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছি। (১৯) আপাতত, স্থান-সংক্ষেপের খাতিরে তার সবটুকু উল্লেখ করা গেল না।

ফ্রয়েড নিজের সঙ্গে ডারউইন আর কোপার্নিকাসের তুলনা করছেন। এই তুলনার মধ্যে বাহুল্য থাকলেও এর ভিত্তিতে যে একেবারে কিছুই নেই তা মনে করাও ঠিক হবে না। তার মানে

নিশ্চয়ই এই নয় যে, ফ্রয়েডের মতবাদও বিজ্ঞানের ইতিহাসে কোপার্নিকাস্ আর ডারউইনের মতোই যুগান্তর এনেছে। তার মানে এও নয় যে---ফ্রয়েড নিজে যে-রকম কল্পনা করেছেন—তাঁর মতবাদও মানবাত্মার সনাতন আত্মাভিমানকে সমতুল্যভাবে আহত করেছে বলেই সমজাতীয় প্রতিবন্ধের মুখোমুখি হতে বাধ্য হয়েছে। তার আসল মানেটা এই-ই যে, ফ্রয়েড প্রথম যখন তাঁর মতবাদ পেশ করেছিলেন তখন তাঁর মতবাদও একদিক থেকে কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতা করেছিল আর সেই জন্যেই কায়েমী স্বার্থ সামাজিকভাবে ফ্রয়েডীয় মতবাদের বিরুদ্ধে নানান রকম বাধাবিপত্তি সৃষ্টি করেছিল। অবশ্যই কোপার্নিকাস্ আর বিশেষ করে ডারউইন কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে যে আঘাত হেনেছিলেন তা অনেক বেশি গুরুতর, অনেক প্রচণ্ড। তবুও ফ্রয়েডীয় মতবাদও যে একটা সময়ে আপেক্ষিকভাবে কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে গিয়েছিল এই কথাটাও ভোলা ঠিক নয়। তাতে ইতিহাস-বোধ ব্যাহত হবার ভয় এবং ফ্রয়েড যে কেন নিঃসন্দেহেই বুর্জোয়াশ্রেণীর মতবাদগত প্রচারক, সে কথা স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করবার মধ্যেও ফাঁক থেকে যাবার সম্ভাবনা।

মনে রাখতে হবে, সে-সময়ে ফ্রয়েডীয় মতবাদের মূল আওয়াজ ছিল 'ব্যক্তিগত যৌন-প্রণয়ের' আওয়াজ, যৌন জীবনে মুক্তির আওয়াজ। এবং এঙ্গেলস্ দেখাচ্ছেন, এই আওয়াজ বুর্জোয়া সভ্যতারই আওয়াজ, বুর্জোয়া সভ্যতার আগে পর্যন্ত এই দাবি তোলবার মতো বাস্তব পরিস্থিতি মানুষের ইতিহাসে দেখা দেয়নি। য়ুরোপীয় সামন্ত যুগেও নয়। যে-যুগে মানুষের যৌন-সম্পর্ককে একেবারে অন্য চোখে দেখবার চেষ্টা। তাছাড়া, যে-সমাজে যে-যুগে ফ্রয়েডের মতবাদ দানা বাঁধছে—সেই

সমাজে সেই যুগে, য়ুরোপীয় সামন্ত সভ্যতার সমস্ত চিহ্নই সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। (১৮৭০-৭৫-এর অস্ট্রিয়া-কায়েমী স্বার্থের মধ্যে তখনও সেখানে সামন্ততন্ত্রের স্পষ্ট ভগ্নাবশেষ।) ফ্রয়েডের মতবাদ তাই এই দিক থেকে কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতা করেছে আর প্রত্যুত্তরে কায়েমী স্বার্থের কাছ থেকে বিরোধিতাও পেয়েছে। অর্থাৎ, তিনি বুর্জোয়া শ্রেণীর নানান দাবির মধ্যেই একটা দাবি তুলেছিলেন বলেই সেই যুগে বুর্জোয়া বিরোধী রক্ষণশীল শ্রেণী তাঁর বিরুদ্ধে নানান রকম বাধাবিপত্তি সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু সমাজ-সচেতন দৃষ্টিতে সেই বাধাবিপত্তির বিশ্লেষণ না করে, বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন এক "বিশুদ্ধ" মনস্তত্ত্ব দিয়ে এই বাধাবিপত্তির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ফ্রয়েড তাঁর ওই আধা-রহস্যময় 'প্রতিবন্ধ'-র মতবাদ সৃষ্টি করলেন।

এইখানে একটা কথা খুব স্পষ্টভাবে মনে রাখা দরকার, নইলে প্রগতির ওজুহাত ফ্রয়েডীয় মতবাদ নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত উচ্ছ্বাসের অবকাশ থেকে যাবার সম্ভাবনা। সামন্ততান্ত্রিক সমাজের তুলনায় ধনতন্ত্রের ওই আওয়াজ—যৌন মুক্তির দাবি, ব্যক্তিগত যৌন প্রণয়ের দাবি—অনেক প্রগতিশীল সন্দেহ নেই। কিন্তু এই প্রগতিটা নেহাতই আপেক্ষিক প্রগতি, কোনো চরম প্রগতি নয়। কেননা, সামন্ততন্ত্রের তুলনায় ধনতন্ত্র স্বর্গ হলেও সমাজতন্ত্রের তুলনায় নরকই। যৌন সম্পর্কের বেলাতেও একই কথা। তাই প্রকৃত প্রগতিপন্থীর পক্ষে, সমাজতন্ত্রীর পক্ষে এই আপেক্ষিক প্রগতিকে চরম প্রগতি মনে করাটা নেহাতই মারাত্মক ভ্রান্তি হবে। মনে রাখা দরকার, মতবাদ এবং প্রয়োগ উভয় দিক থেকেই যৌন মুক্তির এই বুর্জোয়া বা ফ্রয়েডীয় সংস্করণটির মধ্যে ফাঁকি আছে। এঙ্গেলস্-এর মূলসূত্র অনুসরণ করে মতবাদের দিক থেকে যে-ফাঁকি তার আলোচনা একটু পরেই তুলবো।

তার আগে প্রয়োগের দিক থেকে ফাঁকির দৃষ্টান্তটা তোলা যাক। জার্মান বৈপ্লবিক আন্দোলনের একটা যুগে তরুণ সমাজতান্ত্রিকদের মনে ফ্রয়েডীয় মতবাদের এই কথাটা একরকম মোহ সৃষ্টি করেছিল, এবং সমাজ-বাস্তবকে পরিবর্তন করবার চেয়ে—যে পরিবর্তন না হলে প্রকৃত যৌন মুক্তির কথা আকাশকুসুমের মতো অলীক হয়েই থাকবে—তাঁরা নিছক এই যৌন মুক্তির আদর্শের উপাসক হতে চাইলেন। ফলে তাঁদের ব্যবহারিক জীবনের প্রকৃত মুক্ত যৌন আদর্শের বদলে জুটেছিলো যৌন অরাজকতার সম্ভাবনা—এ্যানারকিস্‌ম্‌। এবং এ-বিষয়ে লেনিনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে তিনি এর অত্যন্ত কঠোর সমালোচনা করেন। যে-ফ্রয়েডবাদের মোহে বৈপ্লবিক কর্মীদের মধ্যে এই এ্যানারকিস্‌ম্‌-এর সম্ভাবনা লেনিনের সমালোচনায় সে-সম্বন্ধে তীব্র, তীক্ষ্ণ মন্তব্য।

আসলে, বুর্জোয়া সভ্যতা বা ধনতন্ত্র মানুষের সামনে যে-সব রঙিন প্রতিজ্ঞা পেশ করেছিল ধনতন্ত্রের কাঠামোর মধ্যে সেগুলির বাস্তব বিফলতা অত্যন্ত করুণ। ব্যক্তিগত যৌন প্রণয় বা যৌন মুক্তির আওয়াজ সম্বন্ধে ঠিক এই কথাই। যৌন মুক্তির ওই আওয়াজ বুর্জোয়া বাস্তবে অবারিত গণিকা-প্রথার গ্লানিতে পর্যবসিত। এঙ্গেলস্‌ দেখাচ্ছেন, এর আসল কারণ হলো প্রকৃত যৌন মুক্তির জন্যে যে সামাজিক প্রস্তুতি প্রয়োজন বুর্জোয়া সভ্যতার কাঠামোর মধ্যে তা বাস্তবে পরিণত হওয়া সম্ভব নয়। সামাজিক প্রস্তুতিটা হলো, মেয়েদের মধ্যে সামাজিক মেহনতের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা, সামাজিক মেহনতের ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুরুষের সাম্য কায়েম করা। সামন্ততন্ত্রের আওতায় এ-কথা সম্ভাবনা হিসেবেও বাস্তব ছিল না, ধনতন্ত্রের আওতাতেই প্রথম সম্ভাবনা হিসেবে বাস্তব হলো। কিন্তু এই সম্ভাবনাকে সত্যিই বাস্তবে

পরিণত করতে গেলে ধনতন্ত্রের ভিত্তিই কেঁপে ওঠে—ধনতন্ত্রের পক্ষে আর টেকাই সম্ভব হয় না। তাই যৌন মুক্তির যে আদর্শ বুর্জোয়া সমাজে প্রথম শোনা গেলো বুর্জোয়া বাস্তবে সেই আদর্শের চরম অবমাননা।

এই হলো এঙ্গেলস্-এর বিশ্লেষণ: যৌন মুক্তির আদর্শ পুঁজিবাদী সভ্যতারই আদর্শ অথচ এই আদর্শকে বাস্তবে পরিণত করবার যে অনিবার্য শর্ত—স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে সামাজিক মেহনতের সাম্য কায়েম করা—তা ওই বুর্জোয়া সমাজের কাঠামোকেই চৌচির করে দিতে চায়। তাই বুর্জোয়া বাস্তবে বুর্জোয়া আদর্শের অমন করুন পরাজয়।

কিন্তু ফ্রয়েড প্রসঙ্গে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে না। কেননা ফ্রয়েডীয় মতবাদ যে বুর্জোয়া স্বার্থের সঙ্গে যে কী রকম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত তার পক্ষে খুবই জরুরী আরও একটা কথা উল্লেখ করা দরকার। ফ্রয়েড শুধুই যৌন মুক্তির আওয়াজ তোলেননি, বুর্জোয়া স্বার্থের সঙ্গে সমান তাল রেখে আপাত-বৈজ্ঞানিক মনস্তত্ত্বের দোহাই দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, মেয়েরা সত্যিই ছোটো, পুরুষের সঙ্গে সমান সমান হতেই পারে না। মেয়েরা যে ছোটোই তা প্রমাণ করবার আশায় ফ্রয়েড শুধু এইটুকুই বলছেন না যে পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের মধ্যে sublimation বা উৎগতির শক্তি অনেক কম। নারীচরিত্রের একটি সার্বভৌম লক্ষণ হিসেবে তিনি তাঁর বিখ্যাত penis-envy বা 'লিঙ্গ-ঈর্ষা'-র মতবাদ পেশ করেছেন। এই মতবাদের মূল কথা হলো, পুরুষ-জনন-অঙ্গের অনুরূপ একটি অঙ্গ আপন দেহে নেই বলেই সমস্ত মেয়ে মনে-প্রাণে নিজেকে পুরুষের তুলনায় হীন ও হেয় জ্ঞান করে এবং যদিই বা কোনো মেয়ে রোখ করে পুরুষের সঙ্গে পাল্লা দিতে যায় তাহলে বুঝতে

হবে তার এই ব্যবহারটা আসলে ওই হেয়-বোধের গ্লানি থেকে আত্মরক্ষার প্রয়াসমাত্র (defense reaction)। সাধারণ পাঠকের সহজ বুদ্ধির কাছে এই মতবাদটা যতই আষাঢ়ে কথা হোক না কেন, আধুনিক সাইকোএ্যানালিটিক্যাল সাহিত্যের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনিই জানেন এই মতবাদ নিয়ে কতোই না গুরুগম্ভীর আলোচনা। আপাতত, সে-আলোচনার খুঁটিনাটি উল্লেখ করবার অবসর নেই, কিন্তু সমাজ-সচেতন ব্যক্তিমাত্রই অবাক হয়ে স্বীকার করবেন পুরুষ-প্রধান সমাজব্যবস্থার সমর্থনে এমন অভিনব ও ধূর্ত যুক্তি আর কখনো পেশ করা হয়েছে কিনা তা অত্যন্ত সন্দেহের কথা।

বুর্জোয়া সমাজের দুটো দিকের কথাই ভেবে দেখুন: সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে যৌন মুক্তির আওয়াজ, আবার সমাজতান্ত্রিক আওয়াজের বিরুদ্ধে মেয়েদের হেয় ও হীন প্রতিপন্ন করবার উৎসাহ। এই দুটো কথা স্পষ্টভাবে মনে রাখলে সিগ্‌মুণ্ড ফ্রয়েডকে পুঁজিবাদী সভ্যতার অভ্রান্ত প্রচারক বলে শনাক্ত করতে অসুবিধে হবে না। এবং 'প্রতিবন্ধ' নাম দিয়ে তিনি যে মতবাদটি পেশ করেছেন তার আসল তাৎপর্যটুকুও এই দিক থেকেই বুঝতে পারা যাবে: পুঁজিবাদী সভ্যতার অভ্রান্ত প্রচারক বলে সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ এককালে তাঁর বিরুদ্ধে বাধা-আপত্তি তুলেছিলো। কোনো রকম নির্জ্ঞান রহস্যের কথা বলে ওই 'প্রতিবন্ধ'র ব্যাখ্যা করবার দরকার নেই। আর তাই যদি করতে চান তাহলে আধুনিক দুনিয়ায় মুমূর্ষু ধনতন্ত্র কেন অমন মরিয়ার মতো ফ্রয়েডবাদ নিয়ে মেতে উঠেছে তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে রকমারী গোঁজামিল চালাতে হবে। আর্নস্ট জোন্স যেমন প্রায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলেছেন, বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে মানুষের সংস্কার দিনের পর দিন দুর্বল হয়ে আসছে। তার মানে, মানুষ

বলে জীব বুঝি বিজ্ঞানের জন্মশত্রু। কথাটা কিন্তু বাজে কথাই। কেননা বিজ্ঞান তো আর মঙ্গলগ্রহ থেকে কোনো রকম বিরুদ্ধ আমদানি নয়, মানুষেরই সৃষ্টি। মানুষ কেন বিজ্ঞানের জন্মশত্রু হবে? তা যদি হতো তাহলে মানুষ হাজার বছর ধরে অমন অক্লান্ত পরিশ্রম আর স্বার্থত্যাগ সহ্য করে বিজ্ঞানকে গড়ে তুললো কেন? বিজ্ঞান তো মানুষের পরম সুহৃৎ, মানুষকে মুক্তির পথ দেখায়। কোনো বিশেষ শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থের বিরোধিতা করলে পরই সেই শ্রেণী বিজ্ঞানের শত্রু হতে পারে, কিন্তু সমস্ত মানুষ সম্বন্ধে এমনতর কোনো কথা বলাটা হলো দুনিয়ার কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে ওকালতি করাই; কেননা আজ বিজ্ঞানের অগ্রগতি কায়েমী স্বার্থকে ধ্বংস করার মুখোমুখি হয়েছে।

ফ্রয়েডের ওই তথাকথিত 'প্রতিবন্ধ' সম্বন্ধে মতবাদকে বিচার করতে হলে আরও একটি প্রশ্ন তোলা একান্তই দরকার: আজকের পৃথিবীতে যে-সব দেশে মুমূর্ষু ধনতন্ত্রের পক্ষে বাঁচবার জন্যে সবচেয়ে মরিয়ার মতো প্রচেষ্টা সেইসব দেশগুলিতেই ফ্রয়েডীয় মতবাদ নিয়ে আজ এমন মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহ কেন? ধনতন্ত্রের নাগপাশ থেকে যে-সব দেশ মুক্তি পেয়েছে সেই সব দেশে তো এ-আগ্রহের ছিটেফোঁটাও নেই। কোনো রকম নির্জ্ঞান রহস্যের কথা তুলে এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া চলে না। কেননা, জবাবটা আসলে সমাজতত্ত্বের কাছ থেকেই পাওয়া সম্ভব। ফ্রয়েডীয় মতবাদ একান্তভাবেই ধনতান্ত্রিক সভ্যতার স্বার্থে প্রণোদিত, তাই সামন্ততন্ত্রের তরফ থেকে কায়েমী স্বার্থ এর বিরুদ্ধে এককালে যে-রকম আপত্তি তুলেছিল আজকের দিনে মুমূর্ষু ধনতন্ত্র সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তার চেয়েও বেশি আগ্রহে এই মতবাদটির উপরই নির্ভর করতে চায়।

ফ্রয়েডীয় মতবাদের সমর্থনে মুমূর্ষু সমাজটার 'প্রতিবন্ধ'র বদলে মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহই। অবশ্য মনে রাখতে হবে, ফ্রয়েডীয় মতবাদের তরফ থেকে এই উৎসাহ প্রাপ্তির প্রত্যুত্তরে একরকম কৃতজ্ঞতাও দিনের পরদিন প্রকট হয়েছে। কৃতজ্ঞতার এই বিকাশটা বিশেষ করে লক্ষ্য করবার মতো। কেননা, ফ্রয়েডীয় মতবাদ এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজটরা কাছ থেকে যত বেশি উৎসাহ পেয়ে চলেছে ততই দিনের পর দিন যৌন মুক্তির ওই পুরনো আওয়াজটা বদলে ফ্রয়েডবাদ এমন সব নতুন ধরনের আওয়াজ তুলছে, যাতে এই মুমূর্ষু সভ্যতার অনেক প্রত্যাক্ষ, অনেক নগদ লাভ। অর্থাৎ, ফ্রয়েডীয় শ্লোগানগুলিরও ইতিহাস আছে। প্রথমে ছিল যৌন মুক্তির শ্লোগান। কিন্তু সে সময়ে এই শ্লোগান বুর্জোয়া সভ্যতার পক্ষে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে যতই সুবিধে সৃষ্টি করুক না কেন কিছুদিন পরেই দেখা গেল এই শ্লোগানের উপরই খুবই বেশি জোর দিতে গেলে বুর্জোয়া সভ্যতার পক্ষে চিড় খেয়ে চুরমার হয়ে যাবার ভয়। ফ্রয়েডীয় মতবাদের শ্লোগান তাই বদলালো। Sense of guilt বা 'পাপবোধে'র উপর ঝোঁক, আর তারপর Aggression বা জিঘাংসার উপর ঝোঁক। এই 'পাপবোধ' এবং 'জিঘাংসাবৃত্তির' কথা প্রচার করলে মুমূর্ষু ধনতান্ত্রিক সভ্যতার লাভটা কী বিলক্ষণ তা আন্দাজ করা কঠিন নয়। পাপবোধের কথায় সংগ্রামী মানুষের দীপ্ত চেতনা ঝিমিয়ে আসবে, জিঘাংসাবৃত্তির কথা বলে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ সমর্থন করা চলবে। কিন্তু তারপর আরও আছে। Death-instinct বা মরণ-বৃত্তির কথাও। মানুষ যে শুধুই খুন করতে চায় তাই নয়, মরতেও চায়। ফ্রয়েডের কল্পনাশক্তি বাস্তবিকই দুর্ধর্ষ : এই মরণবৃত্তির কথাটা ব্যাখ্যা করে তিনি বলছেন, এ যেন পঞ্চভূতের পিছটান। শেষ পর্যন্ত পঞ্চভূত থেকেই তো উৎপত্তি, আমাদের

মনের কোণায় এই পঞ্চভূতের দিকে ফিরে যাবার একটা আকর্ষণ থাকা আর বিচিত্র কী? জন্মাদস্য যতঃ। অথচ, এই মরণবৃত্তির মহিমা শুনিয়ে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে কামানের খোরাক জোগাড় করাও কত সহজ!

তার মানে, ওই তথাকথিত প্রতিবন্ধর বদলে ফ্রয়েডীয় মতবাদের কপালে যতই রাজসম্মান জুটেছে ফ্রয়েডবাদও ততই পুরনো কালের আওয়াজ ভুলে এখন নতুন নতুন আওয়াজ তুলতে শুরু করেছে, যার দরুন এই মুমূর্ষু সমাজটার প্রত্যক্ষ থেকে প্রত্যক্ষতর নগদ বিদায়। ফ্রয়েডবাদের কথা আর ধনতান্ত্রিক সভ্যতার কথা তাই আলাদা করে দেখা চলে না।

এই তো 'ফ্রয়েডের 'প্রতিবন্ধ-সমাচার। এবং ফ্রয়েডের নিজের মতোই সামাজিকভাবে ফ্রয়েডীয় মতবাদের বিরুদ্ধে যে 'প্রতিবন্ধ' তা আসলে চিকিৎসা প্রসঙ্গে দেখতে পাওয়া 'প্রতিবন্ধর'ই পরিবর্ধিত সংস্করণ। এই পরিবর্ধিত সংস্করণটিকে যাচাই করবার সুবিধেই বেশি—শুধুমাত্র বৃহত্তর বলেই নয়, বন্ধ ঘরের গোপন কথা তুলে যে রহস্যসৃষ্টির সুযোগ এখানে তা সম্ভব নয়। এবং এই বৃহত্তর সংস্করণটির সম্যক বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যায় এর পিছনে কোনো নির্জ্ঞান রহস্যের সন্ধান করার পথটা ভুল পথ, কেননা এর পিছনে যেটুকু যাথার্থ্য তা নিছক একটি সামাজিক যাথার্থ্যই।

চিকিৎসার সময় চিকিৎসককে পারিশ্রমিক দিতে হবে। কথাটা এমন কিছু নতুন নয়, বর্তমান পরিস্থিতিতে একে অস্বাভাবিক বা অসঙ্গতও মনে হয় না। তা না হলে, সত্যিই তো, চিকিৎসকের সংসারই বা চলবে কেমন করে? তাই গ্রাম অঞ্চলে ডাক্তার-হাসপাতালের নাগাল না পেয়ে ওঝা-নাপিতের শরণাপন্ন হওয়া থেকে শুরু করে শহরে বিশেযজ্ঞ চিকিৎসকদের নাগাল পেতে গিয়ে ভিটেমাটিটুকুও বন্ধক দেবার অভিজ্ঞতা পর্যন্ত সর্বত্রই আমরা স্বীকার করে নিই যে বৈদ্য-বিদায়ের পালা না চুকিয়ে যমের সঙ্গে যোঝবার বুঝি কোনো কায়দাই হয় না। অবশ্য, সমাজ ব্যবস্থার রকমফের হলে চিকিৎসকের সংসার চালাবার দায়টা রাষ্ট্রই গ্রহণ করতে পারে। রোগী তখন ব্যক্তিগতভাবে শুধু রোগ যন্ত্রণাই নয়, দক্ষিণা সংগ্রহের যন্ত্রণা থেকেও মুক্তি পেতে পারেন। কথাটা এমন কিছু অসম্ভব কল্পনা নয়। সোবিয়েট য়ুনিয়নের মতো উন্নততর সমাজ ব্যবস্থায় সত্যিই তো এই ব্যাপার ঘটেছে। এমন কি বিলেত যে বিলেত, সেখানকার তথাকথিত শ্রমিক সরকারের আমলেও সত্যিই এই রকমের একটা পরীক্ষা চলেছিলো, যদিও অবশ্য রক্ষণশীল দল রাষ্ট্রশক্তি হাতে পেয়েই দেখিয়ে দিলো ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে সমাজতান্ত্রিক কোনো পরীক্ষা নিয়ে ছেলেখেলা করতে যাওয়াটা মারাত্মক ব্যাপার—শুনেছি ইতিমধ্যেই অনেক রকম সংশোধনাদির সাহায্যে বিলেত দেশে এই ব্যবস্থাটিকে পঙ্গু করবার আয়োজন শুরু হয়েছে।

যাই হোক, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা একটু পরেই তুলতে হবে। তবুও উপস্থিত না হয় ধরেই নেওয়া যাক যে চিকিৎসার বিনিময়ে রোগীর তরফ থেকে চিকিৎসককে উপযুক্ত পারিশ্রমিক যোগাবার ব্যবস্থায় আমরা এতদিন ধরে এবং এমনভাবে অভ্যস্ত হয়েছি যে শুধু এইটুকুর মধ্যে অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত কিছু আমাদের চোখে পড়ে না। তাই মনোবিকারের রোগীও ফ্রয়েডপন্থী চিকিৎসককে দৈনিক ফী দেবেন—এ তো খুব সহজ কথাই। এবং ফ্রয়েডপন্থী নিশ্চয়ই বলবেন, সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে যে-সমালোচনা তা যদিও বা সঠিক হয় তাহলেও সে তো একটা সমাজ-ব্যবস্থার সমালোচনাই। তাকে চিকিৎসা-জীবিকার বিরুদ্ধে—বিশেষ করে একটি নির্দিষ্ট চিকিৎসাকৌশলের বিরুদ্ধে—সমালোচনা হিসেবে প্রচার করবার অবসর কোথায়?

উত্তরে বলবো, এ-কথা অবশ্যই ঠিক যে চিকিৎসা-ব্যবসায়ের বর্তমান নিন্দনীয় পরিস্থিতি প্রধানতই একটা বিশেষ সমাজ-ব্যবস্থার পরিণাম। তাই জনগণের বিরাট অংশ চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে যদি ব্যক্তিগত চিকিৎসকের উপর আক্রোশ প্রকাশ করে তাহলে সেটা ভুলই হবে; কেননা আক্রোশটা সমাজ-ব্যবস্থার দিকেই নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। তবুও কিন্তু, এই দিক থেকেই ফ্রয়েডীয় কৌশলের বিরুদ্ধে সমালোচনার অবসর আছে। প্রথমত, বাস্তব অবস্থার কথাটা ভেবে দেখুন। একজন সাধারণ চিকিৎসকের পক্ষে একই দিনে বহুসংখ্যক রোগকে পরীক্ষা করা সম্ভব, কিন্তু ফ্রয়েডীয় চিকিৎসকের পক্ষে তা সম্ভব নয়, কেননা তাঁর পদ্ধতিটা খুবই সময়সাপেক্ষ। প্রত্যেক রোগীর জন্যে প্রায় ঘণ্টাখানেক করে সময় দিতে হয়। ফলে. সাধারণ চিকিৎসার তুলনায় ফ্রয়েডপন্থী কী-এর হার বাড়িয়ে পুষিয়ে নিতে চান। তার উপর তাঁর পদ্ধতিটা দারুণ

দীর্ঘমেয়াদী—কম পক্ষে দু-তিন শো দিনের ব্যাপার। ফলে রোগীর তরফ থেকে মোট যে-পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা শুধু এই সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণীর লোকের পক্ষেই যোগানো সম্ভব। অর্থাৎ, বাস্তবভাবে ফ্রয়েডীয় কৌশলের ফলাফলটুকু শুধুমাত্র ধনিকশ্রেণীর পক্ষেই উপভোগ করা সম্ভব, এ-পদ্ধতি জন-সাধারণের কল্যাণপ্রয়াসী হতেই পারে না।

ফ্রয়েডপন্থী নিশ্চয়ই জবাব দিয়ে বলবেন (ফ্রয়েড নিজে যে রকম বলেছেন), এক্ষেত্রে যদি অপবাদের ভাগী কাউকে করতেই হয় তাহলে তো ব্যারামটাকেই করা উচিত। কতকগুলো অসুখ-বিসুখের চিকিৎসা তো সত্যিই ভয়ানক ব্যয়সাপেক্ষ ও সময়সাপেক্ষ। যেমন ধরুন, ক্যানসার রোগ। এ-জাতীয় রোগভোগের চিকিৎসা গরিব লোকদের সাধ্যাতীত। কিন্তু এ নিয়ে চিকিৎসা কৌশলের নিন্দা করে লাভ কি?

ফ্রয়েড যে ক্যান্সার-জাতীয় দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসার সঙ্গে নিজের চিকিৎসা-পদ্ধতির তুলনা করেছেন আপাতত তা যুক্তিসহ মনে হলেও আসলে কিন্তু এর মধ্যে একটা দারুণ ফাঁকি আছে। ফাঁকিটার বর্ণনা এই বলে শুরু করতে পারি যে ক্যান্সারে চিকিৎসা ব্যয়সাপেক্ষ হলেও এ-রোগের দাতব্য চিকিৎসা হতে পারে না। চিকিৎসক যদিই বা খুব সহৃদয় ব্যক্তি হন এবং অর্থাগমের উপায়ান্তরের নির্ভরে যদিই বা তাঁর মনে নিছক জনহিতার্থে চিকিৎসা করবার সাধু ইচ্ছে ঠাঁই পেতে পারে, তাহলেও কিন্তু বিনা পয়সায় চিকিৎসা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। তার কারণ, এই চিকিৎসার সময় রোগীর কাছ থেকে অর্থগ্রহণ শুধুমাত্রই চিকিৎসকের উপার্জনের খাতিরে নয়, এটা হলো চিকিৎসা-পদ্ধতির একটা অনিবার্য অঙ্গই। ফ্রয়েড নিজেই স্বীকার করেছেন, শুরুর দিকে বৈজ্ঞানিক তথ্য আহরণের আশায়

তিনি কিছু কিছু দাতব্য চিকিৎসার চেষ্টা করে দেখেছেন যে তাতে সত্যিই চিকিৎসা চলে না। এবং এই অভিজ্ঞতা একা ফ্রয়েডের নয়। যে-কোনো ফ্রয়েডপন্থী নিশ্চয়ই মানবেন যে বিনা পয়সায় এ চিকিৎসা করতে গেলে শেষ পর্যন্ত ঠকে যেতে হয়। তাই চরক-সুশ্রুত বা হিপোক্রেটিসের সময় থেকে শুরু করে একেবারে অতি-আধুনিক লবোটমি-লিউকোটমি পর্যন্ত চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসে যত অজস্র রকমের কায়দা-কানুনই আবিষ্কৃত হোক না কেন, তার মধ্যে একমাত্র ফ্রয়েডীয় কায়দারই বৈশিষ্ট্য হলো রোগীর সঙ্গে আর্থিক আদায়ের সম্পর্ক স্থাপনের অনিবার্যতা। আর এই অনিবার্যতাকেই ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলের মধ্যে বুর্জোয়া ভাবাদর্শের প্রকটতম প্রকাশ বলেই উল্লেখ করতে চাই।

ফ্রয়েডীয় চিকিৎসা-প্রসঙ্গে রোগী যদি চিকিৎসককে প্রশ্ন করেন, ফী-টা কেন এই চিকিৎসা কৌশলের অনিবার্য অঙ্গ? তাহলে, প্রথম দিকে চিকিৎসক কিছু কিছু আপাত-যুক্তিযুক্ত উত্তর দেবেন। হয়তো বলবেন, এই চিকিৎসায় তো ওষুধপত্তরের ব্যাপার নেই, শুধু কথাবার্তার ব্যাপার। তার ওপর যদি ফী-ও না থাকে তাহলে রোগী তো চিকিৎসা পদ্ধতিকে তেমন পাত্তা দিতে চাইবেন না। কিংবা, চিকিৎসক হয়তো বলবেন, মনোবিকার থেকে রোগী যে একরকম বিকৃত সুখ পেয়ে থাকে; তাই দৈনিক খেসারত-এর মাথায় পড়লে রোগীর হুঁশ হবে রোগটা লাভের ব্যাপার নয়, লোকসানের ব্যাপার। অবশ্যই চিকিৎসকের এই যুক্তিগুলিই তাঁর আসল যুক্তি নয়। আর তা যে নয় তার একটা প্রমাণ হলো, ফী দেবার রীতিনীতি সম্বন্ধে তিনি রোগীর উপর কতকগুলি কড়াকড়ি শর্ত ধার্য করে দেন: দৈনিক ফী দিতে হবে, মাস গেলে পুরো মাসের ফী দেওয়া এমন কি আগামও দেওয়া চলবে না। তাছাড়া,

কাঁচা টাকায় ফী দিতে হবে—চেক নয়, এমন কি কাগজের নোটও নয়। ব্যাপারটা একেবারে সোনারুপোর ব্যাপার হওয়া চাই। কিন্তু তা কেন? চিকিৎসার প্রথম অবস্থায় রোগী এই প্রশ্ন তুললে চিকিৎসক বলবেন, আসল তাৎপর্যটা শুরুতে দেখানো সম্ভব নয়, পরে দেখতে পাওয়া যায়। তার মানে, কাঁচা টাকায় ফী দেবার একটা গূঢ় তাৎপর্য আছে।

গূঢ় তাৎপর্যটা কী? ফ্রয়েডপন্থী হয়তো সাধারণ সামাজিকভাবে তা নিয়ে আলোচনা তুলতে চাইবেন না, তাঁর মতে মনঃসমীক্ষণের পটভূমির (psychoanalytical situation-এর) বাইরে মনঃসমীক্ষণের আসল বক্তব্যগুলো খাপছাড়া আর আজগুবি শোনাতে পারে। এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, দিনের পর দিন ধরে বন্ধ ঘরের কৃত্রিম পরিস্থিতিতে একজাতীয় আলোচনা হতে হতে যে-আবহাওয়া গড়ে ওঠে সেই আবহাওয়াটুকু বাদ দিয়ে শুধুমাত্র সিদ্ধান্তটুকুর কথা শুনলে সাধারণের পক্ষে খুবই খাপছাড়া আর আজগুবি লাগবার সম্ভাবনা। কিন্তু, ফ্রয়েডপন্থীর কথা যদি বৈজ্ঞানিকভাবে বাস্তব হবার দাবি করে তাহলে দিনের আলোর আলোচনা তাঁকে সহ্য করতেই হবে। ফ্রয়েডীপন্থী যদি তাতে রাজী না হন তাহলে তাঁকে মানতেই হবে যে তাঁর দাবিটুকু আর যাই হোক বৈজ্ঞানিক নয়, ধর্মতত্ত্বের মতো 'নিহিতং গুহায়াং" কোনো রহস্যই। আশা করি ফ্রয়েডপন্থী তাতে রাজি হবেন না।

ফী-সংক্রান্ত তাঁদের ওই গূঢ় সমাচারটি ঠিক কী? ফ্রয়েডপন্থী বলবেন, অচেতন মনের কাছে কাঁচা টাকা বলে জিনিসটার একটা প্রতীকী মূল (symbolic value) আছে। অর্থাৎ, আমাদের সচেতন সংসারী মনের কাছে টাকার যে সাংসারিক মূল্য, অচেতন মনের কাছে তা নয়। অন্য একটা ব্যঞ্জনাগত মূল্য। কেননা টাকা হলো যৌনবস্তুর প্রতীক—অর্থাৎ অচেতন মন টাকাকে যৌনবস্তুর

শামিলই মনে করে। ফলে, চিকিৎসক-রোগীর মধ্যে এই বস্তুর আদান-প্রদান ক্রমশই দুজনের মধ্যে একটা হৃদয়গত সম্পর্ক স্থাপন করে: সেই সম্পর্কের নামই হলো সংক্রমণ বা transference। এবং ফ্রয়েডপন্থী বলেন, এই সংক্রমণ বলে হৃদয় সম্পর্কটাই চিকিৎসার সময়ে সবচেয়ে কার্যকরী শক্তি। যে-ক্ষেত্রে সংক্রমণ সম্ভব নয়, সে-ক্ষেত্রে ফ্রয়েডীয় চিকিৎসাই সম্ভব নয়।

অচেতন মন বা যৌন-প্রতীক সম্বন্ধে ফ্রয়েডীয় সিদ্ধান্তগুলির কথা স্বতন্ত্র ভাবে আলোচনা দরকার। কেননা এইগুলি ফ্রয়েডীয় সিদ্ধান্তের স্তম্ভবিশেষ। আপাতত তাই বিচার-সাপেক্ষ এই ধারণাগুলির কথা বাদ দিয়েই ফী সম্বন্ধে ফ্রয়েডীয় বক্তব্যের বিশ্লেষণ করা যাক। তাহলে মোদ্দা কথাটা এই দাঁড়ায় যে রোগী-চিকিৎসকের মধ্যে একটা হৃদয়ের সম্পর্ক (সংক্রমণ) গড়ে না উঠলে এ-পদ্ধতিতে চিকিৎসা সম্ভব নয় এবং কাঁচা টাকার লেনদেন বাদ দিয়ে সম্ভব নয় মনের সম্পর্ক গড়ে তোলা।

একমাত্র কাঁচা টাকাই পারে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক পাতাতে। মিথ্যে কথা নয়। তবু কিন্তু চিরন্তন কোনো সত্যও তো নয়। একমাত্র বিশেষ-এক সভ্যতার বেলাতেই কথাটা সত্যি। সে-সভ্যতা শুরু হবার আগে পর্যন্ত মানুষের সম্পর্ক এমন নির্লজ্জ নির্মমভাবে কাঁচা টাকার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সে-সভ্যতার পরমায়ু ফুরোলে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এমন এক অমানুষিক বস্তুর শক্তি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হবে না। সেই সভ্যতারই নাম হলো বুর্জোয়া সভ্যতা। The bourgeoisie...has left no nexus between man and man than naked self-interest, than callous 'cash payment"। নগ্ন স্বার্থপরতা, হৃদয়হীন "নগদ বিদায়" ছাড়া বুর্জোয়া শ্রেণী মানুষ আর মানুষের

মধ্যে অন্য কোনো সম্পর্ক বাকি রাখেনি। এটা মিথ্যে কথা না হলেও নিশ্চয়ই কোনো গৌরবের কথা নয়। বরং এই কথাটাকে ভালো করে চেনার মধ্যেই বুর্জোয়া সভ্যতার একটি চরম সমালোচনা খুঁজে পাওয়া যায়। তাই বুর্জোয়া সভ্যতার মনের কথাটুকু প্রচার করাই যাঁর মূল উদ্দেশ্য, তাঁর পক্ষে এই কথাটির নগ্ন ও নির্মম রূপকে হরেক রকম রঙিন বুদ্‌বুদ্‌ দিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে তবেই প্রচার করতে হয়। টাকা বলে জিনিসটা আসলে টাকা নয়, যৌনবস্তুর প্রতীক। টাকার লেনদেনটা আসলে টাকার লেনদেন নয় নির্জ্ঞান মনের সহবাস-বিশেষ। তাই টাকা দিয়ে পাতানো মানুষে মানুষে সম্পর্কটা আসলে এক রকম প্রেমের সম্পর্কই। এই হলো ফী-সংক্রান্ত ফ্রয়েডীয় বক্তব্যের আসল চেহারা। বুর্জোয়া সভ্যতার মনের কথাটিই পেশ করা গেলো, কিন্তু এমনই কায়দায় যে ব্যাপারটা বুর্জোয়া সভ্যতার চরম সমালোচনা না হয়ে বেশ মজাদার রহস্যের রূপ ধরে সাধারণের কাছে সহজে স্বীকৃত হতে পারে!

আন্তর্জাতিক সাইকোএ্যানালিটিক্যাল সোসাইটির সভাপতি আর্নস্ট জোন্স ১৯৩৬ সালে তাঁর সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন, "রাশিয়া থেকে আবার কোনো প্রত্যক্ষ খবর (সাইকো-এ্যানালিটিক্যাল আন্দোলনের খবর) আসছে না; কিন্তু সে-দেশে বিজ্ঞান সম্বন্ধে সহিষ্ণুতা শুরু হবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে এবং তার থেকেই আশা করা সম্ভব যে ও-দেশে সাইকোএ্যানালিটিক্যাল কাজকর্ম আবার শুরু হবে।"

বলাই বাহুল্য, সভাপতি মহাশয়ের এই "আশা"টি শেষ পর্যন্ত সফল হয় নি। তার কারণ নিশ্চয়ই এই নয় যে সোভিয়েট রাশিয়ায় "বিজ্ঞানকে সহ্য করতে পারার" লক্ষণ ফুটি-ফুটি করেও শেষ পর্যন্ত আর ফুটলো না। আসল কারণটা বরং একেবারে

উল্টোটাই: সোভিয়েটের নতুন সভ্যতা দিনের পর দিন যতই মজবুত বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ততোই সম্ভব হয়েছে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে বিজ্ঞানবিরোধী সব কিছুকে নির্মমভাবে ঝেঁটিয়ে বাদ দেওয়া। মতবাদ আর প্রয়োগ—থিয়োরি আর প্রাক্‌টিস—দুদিক থেকেই। প্রয়োগের দিক থেকে কথাটা সত্যি, কেননা ফলিত বিজ্ঞানকে মুষ্টিমেয় মুনাফালোভীর মুঠো থেকে মুক্ত করে কী ভাবে মানবকল্যাণের সুবিস্তীর্ণ পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তার প্রথম ও বাস্তব পরিচয় সোভিয়েট রাশিয়াতেই। মতবাদের দিক থেকে সত্যি, কেননা সোভিয়েট বিজ্ঞানীরাই প্রথম দেখালেন কী রকম সমবেত ও সচেতন ভাবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে বিজ্ঞানবিরোধী মতবাদের উর্ণাজালকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে বাস্তব সত্যের মুখোমুখি হতে হবে। আর, একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশের বৈজ্ঞানিকের পক্ষেই বিজ্ঞানের এই মুক্তি কায়েম করা সম্ভব: কেননা অন্যান্য দেশের মতো তাঁদের দেশে তাঁদের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক বিবেকের উপর কোনো মনিবের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মনিবানার চাপ নেই। তাই।

আর তাই জোন্স-এর ওই ''আশা''টা সফল হওয়া সোভিয়েটের পটভূমিতে সম্ভবই নয়। কেননা, এটা তো সত্যিই বিজ্ঞানের সফলতা কামনা করা নয়, বিজ্ঞানের নামে নির্লজ্জ বুর্জোয়া-প্রচারের সফলতা কামনা করা। ফী এবং সংক্রমণ—দুই দিক থেকেই বিচার করে দেখুন।

স্বয়ং ফ্রয়েড এবং ফ্রয়েডপন্থীরা বারবার বলছেন, সংক্রমণই হলো তাঁদের চিকিৎসা-পদ্ধতির মধ্যে সবচেয়ে জোরদার শক্তি। তার মানে কি এই যে চিকিৎসক-রোগীর মধ্যে একটা মনের সম্পর্ক স্থাপিত না হলে মানসিক-চিকিৎসা (psycotherapy) সম্ভব হয় না? মানেটা যদি তাই হয়, তাহলে কিন্তু মানতেই হবে

বুর্জোয়া সভ্যতার কাঠামোর মধ্যে মানসিক চিকিৎসা-পদ্ধতি বলে বিজ্ঞানের কোনো শাখাকে গড়ে তোলবার চেষ্টাটাই অনেকাংশে ব্যর্থ হতে বাধ্য! কেননা, এই সভ্যতায় একটি কৃত্রিম বস্তুর শক্তিই মানুষে-মানুষে সম্পর্ক স্থাপন করার সবচেয়ে জরুরী জায়গাটা দখল করে রয়েছে।

কৃত্রিম বস্তুটির নাম কাঁচা টাকা। আর তাই যদি হয় তাহলে বাস্তব অর্থে সংক্রমণ—সত্যিকারের মনের সম্পর্ক—এই কাঠামোর মধ্যে সম্ভব হবে কেমন করে? যতোদিন কাঁচা টাকার আদান-প্রদানই মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নির্ণয় ব্যাপারে চূড়ান্ত ও চরম শক্তি হয়ে থাকে, ততোদিন পর্যন্ত মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটাও কৃত্রিম ও মিথ্যা হতে বাধ্য। তাই নিজেরই প্রতিজ্ঞা থেকে শুরু করে ফ্রয়েডপন্থীর পক্ষে শেষ পর্যন্ত একটা অসহায় স্বীকৃতিতে না পৌঁছে আর উপায়ই থাকে না। ফ্রয়েডবাদ মনোবিকারের আদর্শ চিকিৎসা-কৌশল হতে চেয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানুষের সঙ্গে মানুষের একটা বিকৃত সম্পর্ককে আঁকড়ে ধরেই ফ্রয়েডপন্থীকে রোগমুক্তির রাস্তা খুঁজতে হলো!

রোগীর পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে চিকিৎসককে কাঁচা টাকায় ফী না দিলে-এ চিকিৎসার কায়দা নেই। এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক সময় অনেক রকম জল্পনা-কল্পনা করা হয়। প্রশ্নটা হলো, উন্নততর সমাজ-বাস্তবে দেশবাসীর চিকিৎসার খরচটা যদি রাষ্ট্রব্যবস্থাই গ্রহণ করে, কিংবা আজকের দিনে কাঁচা টাকার যে মূল্য ও শক্তি তা যদি উন্নততর সমাজ ব্যবস্থায় একেবারে বদলে যায়, তাহলে তখন এই চিকিৎসা কৌশলটির কী হবে? কেউ বা আন্দাজ করে বলতে চান, রোগী তখন চিকিৎসককে অন্যভাবে অন্য উপঢৌকনের সাহায্যে তৃপ্ত করে মনের সম্পর্কটা পাতাতে চাইবেন। যেমন ধরুন, আসবাবপত্র বা বই উপহার দিয়ে ফী-এর

কাজ চালানো। কিন্তু এ-জাতীয় জল্পনা-কল্পনা নেহাতই ভিত্তিহীন ও ভাসাভাসা ব্যাপার। সমস্যাটাকে তলিয়ে দেখলে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জবাব পাওয়ার কথা।

কথা হলো, টাকা-কড়ির ব্যাপারটা ঠিক কেন? কেননা, বুর্জোয়া-সভ্যতার এইই তো নিয়ম। এ-সভ্যতার মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক পাতাবার আর কোনো কায়দা নেই যে! কিন্তু কেন? কেন এই বুর্জোয়া সভ্যতায় হৃদয়বৃত্তিহীন নগদ টাকার বিনিময় ছাড়া মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক আর কোনো রকমেই হওয়া সম্ভব নয়? মার্কস্‌বাদী দেখান, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটা নির্ভর করে সমাজের মূলে যে উৎপাদন-পদ্ধতি তারই উপর। বুর্জোয়া সভ্যতায় যে উৎপাদন-পদ্ধতি তার বৈশিষ্ট্য হলো প্রধানত দুটো। এক, পণ্য উৎপাদনই উৎপাদনের একমাত্র রূপ হয়ে দাঁড়ালো। দুই, মানুষের মেহনত-শক্তিও এই সভ্যতায় আর পাঁচ রকম পণ্যের মতো এক রকমের পণ্য হয়ে দাঁড়ালো। দুটো কথা ভালো করে বিচার করলেই বুঝতে পারা যাবে এই সভ্যতায় মানুষের মনের উপর নগদ টাকার অমন অসীম প্রভাবটা ঠিক কেন।

নিজে ব্যবহারের জন্যে তৈরি না করে কেনা-বেচার জন্যে কোনো কিছু তৈরি করলে তার নাম দেওয়া হয় পণ্য। বুর্জোয়া সভ্যতার আওতায় পণ্য উৎপাদনই উৎপাদনের একমাত্র রূপ হয়ে দাঁড়ালো। আর তাই মানুষের সবচেয়ে গভীর, সবচেয়ে প্রাথমিক কার্যকলাপের উপর নগদ টাকায় লেনদেনটার প্রভাবই সবচেয়ে অমোঘ, সবচেয়ে চূড়ান্ত প্রভাবে পরিণত হলো। কোনো রকম আদর্শের প্রেরণায়, কোনো রকম—হৃদয়বৃত্তির খাতিরে মানুষের পক্ষে কোনো কিছু করবার অবকাশ আর রইলো না। তাই বুর্জোয়া সভ্যতার আওতায় পৌঁছেই মানুষ দেখলো কাঁচা

টাকার প্রভাবটা কী গভীর, কী রকম সার্বভৌম! এই প্রভাব তার সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে দেয়।

নগ্ন স্বার্থপরতা, হৃদয়বৃত্তি-বিহীন কাঁচা টাকার লেন-দেন ছাড়া বুর্জোয়া শ্রেণী মানুষের সঙ্গে মানুষের আর কোনো সম্পর্ক বাকি রাখেনি।

কিন্তু এ-হেন অবস্থাটা এমন কিছু চিরন্তন হয়ে থাকবে না। কেননা মার্কস্‌বাদী বিশ্লেষণ করে দেখান, বুর্জোয়া শ্রেণীর অবস্থাটা হয়েছে গল্পে-পড়া সেই যাদুকরের মতো, যে কিনা মন্ত্রবলে এমন এক দৈত্যশক্তিকে মর্তে আনলো যে-দৈত্যশক্তিকে আয়ত্তে রাখা তার নিজের পক্ষেই আর সম্ভব নয়। তাই শেষ পর্যন্ত ওই দৈত্যশক্তির হাতেই যাদুকরের মৃত্যু। বুর্জোয়া সভ্যতার উৎপাদনের শক্তি বাড়তে বাড়তে শেষ পর্যন্ত এমন একটা অবস্থায় পৌঁছলো, যে তারই চাপে এ-সভ্যতার কাঠামো চিড় খেয়ে চৌচির হয়ে যায়। উৎপাদনের উপায়গুলোর উপর ব্যক্তিগত মালিকদের মালিকানা আর তাই টিঁকে থাকতে পারবে না, তার বদলে ঘনিয়ে আসতে চায় পুরো সমাজের, পুরো রাষ্ট্রের মালিকানা। তারই নাম হলো সমাজতন্ত্র। আর এই মালিকানার রকম-ফেরের দরুনই উৎপাদনের উদ্দেশ্যও অনিবার্যভাবেই বদলে যেতে বাধ্য: লাভের আশায় নগদ পয়সায় বিক্রি করবার জন্যে উৎপাদন নয় আর, তার বদলে মানুষের অভাব-মোচন, মানুষের কল্যাণের উদ্দেশ্যে উৎপাদন। অর্থাৎ কিনা পণ্য উৎপাদনের যুগ শেষ হওয়া। আর তাই, শেষ হওয়া মানুষের সমগ্র সত্তার উপর কাঁচা টাকার অমন চূড়ান্ত প্রতিপত্তি। তাই আগামীকালের সমাজতান্ত্রিক সভ্যতায় মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক পাতাবার ভিত্তিটা একেবারেই অন্য রকম।

কী রকম? তার জবাব পাওয়া যায় সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনপদ্ধতির দিক থেকে; সমবেত মানুষের অভাব মোচন, সমবেত মানুষের কল্যাণ সাধন—সমাজতন্ত্রের আওতায় উৎপাদনের এই হলো একমাত্র আদর্শ। আর তাই, নগ্ন স্বার্থপরতা বা হৃদয়হীন কাঁচা টাকার লেনদেনের জন্যে কোনো অবকাশ নেই। তার বদলে সহযোগিতার সম্পর্ক—সামাজিক উৎপাদনের কাজে সহযোগিতা।

সংক্রমণ। রহস্যঘন ভাষায়, রহস্যঘন আরো পাঁচ মতবাদের কুয়াশায় আচ্ছন্ন না করে, সংক্রমণের মূল কথাটা যদি বলবার চেষ্টা করা যায় তাহলে বলতে হবে, মানুষের সঙ্গে মানুষের মনের সম্পর্ক স্থাপন করা গেলে মনোবিকারের রোগীকে রোগমুক্তির দিকে এগুতে সাহায্য করা যায়। এই কথাটা তো এমন কিছু জটিল, দুরূহ বা অসম্ভব কোনো কথা নয়।

কিন্তু কথা হলো, আজকের ইতিহাসে আসন্নপ্রায় নতুন সভ্যতায় মনোবিকারের মানসিক চিকিৎসা (Psychotherapy) কোন্ পথে এগুবে? প্রশ্নটার বাস্তব জবাব পাওয়া যায় সমাজতান্ত্রিক সমাজে মনোবিকারের মানসিক চিকিৎসার পদ্ধতি কোন্ পথে সত্যিই এগুচ্ছে তার পরিচয় থেকে। অর্থাৎ কিনা সোভিয়েট সমাজে মনোবিকারের চিকিৎসা-সংক্রান্ত যে-ব্যবস্থা তার থেকেই। অবশ্যই এ-পরিচয় দেওয়া পরিসরসাপেক্ষ। আপাতত তার পূর্ণ পরিচয় সম্ভব নয় নিশ্চয়ই। কিন্তু যে কথাটা এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক অন্তত সেইটুকুর উল্লেখ প্রয়োজন।

আজকের দিনে সোভিয়েট চিকিৎসাবিজ্ঞানে মনোবিকারের যে চিকিৎসাপদ্ধতি তার একটা প্রধান অঙ্গ হলো সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে আর পাঁচজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের সঙ্গে সহযোগী কর্মী হিসেবে রোগীকে পুনঃস্থাপিত করা। সমাজের

বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষা বাদ দিয়ে বন্ধ ঘরের কৃত্রিম আবহাওয়ায় কাঁচা টাকার সাহায্যে রোগী চিকিৎসকের মধ্যে একটা কৃত্রিম সম্পর্ক পাতাবার চেষ্টা নয়। সোভিয়েটের সমাজের গড়নের সঙ্গে সে-চেষ্টা খাপ খেতেই পারে না। তার বদলে, নতুন সমাজব্যবস্থায় মানুষের সঙ্গে মানুষের যে নতুন ও উন্নততর সম্পর্ক তারই দিকে নজর রেখে মনোবিকারের চিকিৎসা প্রয়াস। তাই, সামাজিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে স্বাভাবিক ও সুস্থ সহযোগিতার সম্পর্ক সেই সম্পর্কই গড়ে তুলতে সাহায্য করা।

অতএব, সমাজতন্ত্রের আওতায় বুর্জোয়া অভ্যাসেরই একটি আপাত পরিশোধিত সংস্করণ নয়—কাঁচা টাকায় ফী দেওয়াকে শুধরে উপহার জাতীয় কিছু দেবার ব্যবস্থা নয়—একবারে মৌলিকভাবে ভিন্ন এক ব্যবস্থাই।

ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলের যেটা চরম উদ্দেশ্য তার নাম দেওয়া হয় **adjustment** বা উপযোজন আর আমি বলতে চাই, উপযোজন বলে এই ব্যাপারটিকে ফ্রয়েড এমনই এক অর্থে গ্রহণ করতে বাধ্য হন যার দরুন বিজ্ঞান নিয়ে তাঁর সবটুকু প্রকট উৎসাহই শেষ পর্যন্ত ধর্মমোহের কাছেই প্রচ্ছন্ন আত্মনিবেদনে পরিসমাপ্ত।

বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের আসল তফাতটা মনে রাখতে হবে।

মানুষ যদি মূক পশুর মতো শুধুই প্রকৃতির মুখ চেয়ে বেঁচে থাকতো তাহলে তার পক্ষে ধর্ম বা বিজ্ঞান দুয়ের কোনোটাই সৃষ্টি করবার প্রশ্ন উঠতো না। কিন্তু জীবজগতে ক্রমবিকাশের পথ ধরে মানুষ যে অনেকখানি এগিয়ে এসেছে। তাই তাকে আর শুধু পশু বলা হয় না—অসহায়ের মতো সে বেঁচে নেই প্রকৃতির মুখ চেয়ে। কিন্তু এই কারণেই, মানুষের সামনে যে সমস্যা তা অতি কঠিন ও কঠোর। কেননা, বিরাট আর বিশাল এই শক্তি অতি প্রচণ্ড শক্তির লীলাভূমি। বিপর্যয়ের পর বিপর্যয়ের ঢেউ—সে ঢেউ কাটানোর ওপরেই মানুষের জীবন-মরণের নির্ভর। শুধু যদি প্রকৃতির মুখ চেয়ে বেঁচে থাকবার কথা হতো তাহলে বিপর্যয়রাশি নিয়ে এই যে সমস্যা এই কিনারা খোঁজবার কোনো তাগিদের কথাই উঠতো না। কিন্তু মানুষের বেলায় সে-তাগিদ উঠেছে আর মানুষ চেয়েছে মোটের ওপর দু'রকমের কিনারা—দুটো কিন্তু একেবারে আলাদা পথে এগিয়ে। একটা হলো, প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব স্থাপন করবার—প্রকৃতিকে জয়

করবার পথ। আর একটা হলো, নিজের ভাব-আবেগকে এমন কায়দায় বদল করার পথ যাতে বিপর্যয়ের ওই বোধটাই ভোঁতা হয়ে যায়: বাস্তব বিপর্যয় থেকে নিস্তার পাওয়া নয়, তবু বিপর্যয়-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া বই কি।

প্রথম পথের নাম বিজ্ঞান। দ্বিতীয়র নাম ধর্ম। দুটোর কিন্তু একেবারে দুরকমের পথ। আকাশ-পাতাল তফাত দুয়ের মধ্যে।

বিজ্ঞান চেয়েছে প্রকৃতিকে বদল করতে, প্রকৃতির শক্তিকে স্ববশে এনে মুক্তি পেতে ওই বিপর্যয়ের হাত থেকে। তাই সুদূর অতীতে ভোঁতা পাথরের হাতিয়ার বানিয়ে মানুষ প্রথম যখন প্রকৃতি-জয়ের অভিযান শুরু করলো, তখন থেকেই বিজ্ঞানের বীজ শুরু। পশুর স্তরে এ-চেষ্টা দেখা দেয়নি। পশুজগৎ আর মানবজগতের আসল সীমানায় তাই ওই হাতিয়ারেরই ফলক। আর নিতান্ত নিরভিমান এই আরম্ভটুকু থেকে শুরু করে মানুষের ওই অভিযান আজ তাকে সাফল্যের কোন্ হিমাদ্রি শিখরে পৌঁছে দিয়েছে! উড়োজাহাজের গতি বাড়িয়ে দেশ-কালকে মুঠোর মধ্যে-পাওয়া, মুঠোর-মধ্যে পাওয়া কোন্ অবিশ্বাস্য দৈত্যশক্তি পরমাণুকে চূর্ণ করে! বিজ্ঞানের এই বিজয়বার্তাকে ভুল বুঝলেও চলবে না কিন্তু। মানুষের পক্ষে প্রকৃতিকে জয় করবার এই কায়দাটা তো কোনো আগন্তুক আক্রমণকারীর মতো নয়, যে চায় বিজিত দেশের ওপর নিজের আইনকানুন চাপিয়ে দিয়ে দেশটাকে দখলে রাখতে। মানুষের পক্ষে প্রকৃতির উপর এইভাবে আপন-গড়া আইন-কানুন চাপিয়ে দেবার প্রশ্নই ওঠে না। কেননা, রক্তমাংসে-গড়া মানুষ তো আর পৃথিবীছাড়া কোনো বাইরের জিনিস নয়। মানুষের পক্ষে তাই প্রকৃতিকে জয় করবার কায়দাটা হলো অন্য রকম—প্রকৃতির নিয়মকানুনকে, প্রকৃতির শৃঙ্খলাকেই, স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতরভাবে চিনতে শেখা। এই জ্ঞানের মধ্যেই

তার আসল শক্তির রহস্য। প্রকৃতির শৃঙ্খলাকে যতো স্পষ্টভাবে চিনতে পারা আর মানতে পারা ততোখানিই দাসত্বমুক্তি। এইখান থেকে কিন্তু বিজ্ঞানের স্বরূপকে ভুল বোঝবার আর এক সম্ভাবনা। অনেক চিন্তাশীল যেরকম মনে করেছেন, বিশুদ্ধ জ্ঞান অন্বেষণেই বুঝি বিজ্ঞানের চরম পরিচয়। কিন্তু বিজ্ঞান তো সত্যিই বন্ধ্যা জ্ঞানের উপাসনা নয়। মনে রাখতে হবে, প্রকৃতিকে চেনবার উলটো পিঠেই প্রকৃতিকে জয় করবার কথা—কিংবা যা একই কথা—প্রকৃতির উপর প্রভুত্বে পরিণত বলেই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আসল মর্যাদা। তাছাড়া, মানুষ যেহেতু অনিবার্যভাবে প্রকৃতির অঙ্গ-বিশেষ, সেইহেতু মানুষে-মানুষে যে সম্পর্ক তাও আর পাঁচ-রকম প্রাকৃতিক বিষয়ের মতোই একটি বিষয়-মাত্র। প্রকৃতি-জয়ের পটভূমি থেকে তাই মানুষে-মানুষে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গও বাদ দেওয়া চলে না। নইলে প্রাকৃতিক শক্তির উপরে অনেকখানি প্রভুত্বের মালিক হয়েও মানুষের পিঠ কুঁজো হয়ে থাকবে পরাজয়ের বোঝায়—মানুষে-মানুষে সম্পর্কের নিয়মকানুনকে জয় করবার ব্যর্থতা থেকেই ওই পরাজয়ের উৎস। পরমাণু ভেঙে-পাওয়া দৈত্যশক্তিই কিনা রচনা করলো হিরোসিমা-নাগাসাকির কাহিনী : মানুষের কী আশ্চর্য আবিষ্কার, অথচ কী দারুণ অপমানের ঝলকে মানুষের মুখ একেবারে কালো করে দিলো! প্রকৃতির শক্তিকে জয় করবার উলটো পিঠেই পরাজয়ের কী নির্মম গ্লানি! দেখা গেলো, মানুষ প্রকৃতির শক্তিকে যে-অনুপাতে জয় করতে শিখেছে সেই অনুপাতে জয় করতে শেখেনি মানুষে-মানুষে সম্পর্কের নিয়ম-কানুনকে জয় করতে। তাই যে-কোনো বিজ্ঞানের চরিতার্থতা নিয়ে হিসেব নিকেশ করবার সময় সমাজবিজ্ঞানের পটভূমি থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করা চলে না।

আর ধর্ম। আদর্শের দিক থেকে ধর্মের চেষ্টাটা একেবারেই বীপরিত। ধর্ম চেয়েছে মানুষের ধ্যান-ধারণা আর আবেগ-অনুভূতিকে এমনভাবে বদল করতে যাতে বিপর্যয়ের ওই বার্তাটাই ভুলে থাকা যায়। অবশ্যই, বিপর্যয়ের বোধটুকু নষ্ট হওয়া মানেই বাস্তব বিপর্যয় থেকে নিস্তার পাওয়া নয়। তবু, বিপর্যয়ের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়া বই কি! আর ওই মুক্তির বাণীই হলো ধর্মের আসল বাণী। ধর্ম আর মাদকদ্রব্য তাই সত্যিই সমতুল্য: পরকালের পরমান্ন-স্বপ্ন ইহকালের অন্নাভাবের যন্ত্রণাকে অনেকখানিই লাঘব করতে পারে, বিচারে আসীন বিধাতায় বিশ্বাস সমাজ-বাস্তবের অবিচার পেরিয়ে আশ্বাসের বাণী আনে না কি? তার মানে অবশ্যই অন্নাভাব বা অবিচারের বাস্তব সমাধান নয়। তাই পথ এক ও অদ্বিতীয়, তার নাম বিজ্ঞানের পথ।

ধর্ম ও বিজ্ঞানের এই পার্থক্য-নির্ণয়ে স্বয়ং ফ্রয়েডও খুব বেশি দ্বিমত হবেন না। কেননা, যে-গ্রন্থে তিনি বিশেষ করে ধর্ম-রহস্য উদঘাটনের প্রয়াসী হয়েছেন (The Future of an Illusion) তাতে তিনি স্পষ্টই ঘোষণা করেছেন যে ধর্ম ইচ্ছাপূরণের এক তন্ত্রবিশেষ (পৃ: ৭৬)— অর্থাৎ কিনা নেহাতই অলীক সান্ত্বনার ব্যাপার। তর্ক তুলে কেউ যদি বলেন, ধর্ম নামের ওই অলীক সান্ত্বনাটুকু বাদ দিয়ে মানুষের পক্ষে জীবনের দুর্যোগ আর বাস্তবের নিষ্ঠুরতা সহ্য করাই সম্ভব নয়, তাহলে ফ্রয়েড সাফ জবাব দিয়ে বলবেন—এ-দাবির সঙ্গে তিনি মোটেই একমত নন (পৃ: ৮৫)। ফ্রয়েড বলেছেন, এমনতরো কথা শুধু তার বেলাতেই খাটবে যার মধ্যে কিনা অত্যন্ত শৈশবদশা থেকে এই মিষ্টি বিষ (ধর্ম) ফুঁড়ে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু মানুষ যদি শান্ত সুস্থির পরিবেশে বড়ো হতে পারে তাহলে তার পক্ষে এ-জাতীয় মনোবিকারের ভোগবার কথা নয় আর তাই

মনোবিকার-যন্ত্রণাকে ভোঁতা করবার জন্যে ধর্মের মতো ওই রকম মাদকদ্রব্যের চাহিদাও তার থাকবে না। ফ্রয়েড বলছেন, পরলোক থেকে প্রত্যাশা এইভাবে প্রত্যাহার করে মানুষ এমন এক পরিবেশে পৌঁছতে পারে, যেখানে জীবন কারুর পক্ষেই আর অসহ্য নয়, কেউ নিপীড়িত নয় সংস্কৃতির হাতে (পৃ: ৮৭)। কেউ হয়তো প্রশ্ন তুলতে পারেন: বিজ্ঞানও কি শেষ পর্যন্ত এক রকমের ভ্রান্তিবিলাসই নয়? ফ্রয়েড জোর গলায় জবাব দিয়ে বলেন, নিশ্চয়ই নয়। কেননা, 'we believe that it is possible for scientific work to discover something about the reality of the world throuth which we can increase our power and according to which we can regulate our life.' (পৃ: ৯৫) এবং এই গ্রন্থের শেষ কয়েকটি পংক্তিতে ফ্রয়েডের বলিষ্ঠ ঘোষণা : না বিজ্ঞানকে অলীক বলা চলবে না। বরং বিজ্ঞানের কাছ থেকে যা পাওয়া যায় না তা আর কোথা থেকে পাওয়া সম্ভব—এমনতরো কল্পনাই হবে আসলে অলীক (পৃ: ৯৮)।

অথচ, বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গির এমনই অন্তর্দ্বন্দ্ব যে, বিজ্ঞানে ওই প্রকট বিশ্বাস, ধর্ম সম্বন্ধে এমন বলিষ্ঠ মোহমুক্তি, মানুষের ভবিষ্যতে এমন আশ্চর্য আস্থা—সব কিছুই শেষ পর্যন্ত তাঁকে ধর্মমোহের মূল কথাটির কাছে আত্মনিবেদনেরই পথ প্রদর্শন করলো। কেবল মনে রাখতে হবে, এই ধর্মমোহ নবকলেবরের। তার মানে, চেহারার দিক থেকে মামুলি ধর্মমোহের সঙ্গে নিশ্চয়ই তফাৎ আছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তফাতটা ধর্মমোহ হিসেবে।

ধর্মমোহের কাছে ফ্রয়েডের যে-আত্মনিবেদন তার পরিচয়

তাঁর কলাকৌশলের চরম উদ্দেশ্যটুকুর মধ্যে। তারই নাম হলো উপযোজন। উপযোজন বলে ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করা যাক।

প্রশ্ন হলো, ফ্রয়েডপন্থীর ওই সুদীর্ঘ কলাকৌশল মানবমনের ঠিক কোন্ পরিবর্তন সাধন করতে চায়? অল্প কথায় উত্তর দিতে অনুরোধ করলে তিনি হয়তো বলবেন, মনের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা। কিন্তু প্রশ্ন উঠবে, মনের স্বাভাবিক অবস্থা বলতে ঠিক কী বোঝায়? কিংবা, যা একই কথা, স্বাভাবিক-অস্বাভাবিকের মধ্যে সীমারেখাটা ঠিক কোথায়? দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ব্যাপারে, বা এমন কি সাধারণ চিকিৎসা প্রসঙ্গে এ-প্রশ্নের একটা কাজ চালানো মোটা জবাব পাওয়া হয়তো কঠিন ব্যাপার নয়। কেননা, এদিক থেকে অস্বাভাবিক বলতে অত্যন্ত স্থূল রকমের বিকৃতকেই বোঝা হয় এবং মোটের ওপর চলনসই হলেই স্বাভাবিক বলে স্বীকৃত হয়। যেমন ধরুন, আমি যদি নিরুপদ্রবে ঘরসংসার করি, তাহলে আমাকে স্বাভাবিক মানুষ বলেই স্বীকার করা হবে। কিন্তু কেউ যদি পথে-ঘাটে অনর্থক অসংলগ্ন চীৎকার করে, কিংবা নিজের মনগড়া এক জগতের কল্পনায় বিভোর হয়ে অকারণে হাসে, অকারণে কাঁদে, কিংবা কারুর মাথায় যদি বদ্ধমূল ধারণা দেখা দেয় যে আসলে সে অমুক দেশের রাজা, আর তমুক দেশের রানী তার সঙ্গে প্রণয়ে লিপ্ত বলেই সে-দেশের গুপ্তচরেরা তার আত্মীয়ের ছদ্মবেশ ধরে তার বিরুদ্ধে কূট চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে—তাহলে তাকে স্বাভাবিক বলা হবে না অস্বাভাবিক বলা হবে, এ নিয়ে তর্কের অবসর থাকবে না। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক না হলেও আপনি অনায়াসে বলতে পারবেন এগুলো সবই পাগলামির লক্ষণ।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, যেখানে মনোবিকারের এমন স্থূল বিকাশ সেখানে ফ্রয়েডপন্থীর কলাকৌশল নেহাতই নিরুপায়। স্বয়ং

ফ্রয়েডও সবিনয়ে স্বীকার করেন এ-জাতীয় মনোবিকারের (Psychoses, বা ফ্রয়েডীয় পরিভাষায় Narcessistic Neuroses) চিকিৎসায় তাঁর পদ্ধতি কোনো হদিস দিতে পারে না। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে যে-সব পদ্ধতি এখন পর্যন্ত এ-জাতীয় রোগ সম্বন্ধে আপেক্ষিকভাবে সফল হয়েছে সেগুলির ধরন-ধারণ অন্যরকমের। অবশ্য তাই বলে, ফ্রয়েডপন্থীরা নিজেদের কলাকৌশলকে মোটেই তুচ্ছ জ্ঞান করেন না। কেননা, স্বাভাবিক-অস্বাভাবিকের সীমারেখার সমস্যাটা তাঁদের কাছে মোটেই সহজ সমস্যা নয়। এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার স্তরে যাঁরা কোনোমতে তরে যাচ্ছেন—অর্থাৎ চলিতভাবে আমরা যাঁদের স্বাভাবিক বলে স্বীকার করে নিই—তাঁদের সবাইকার মানসিক সুস্থতা ফ্রয়েডপন্থীর কাছে স্বীকৃত নয়। বস্তুত, যাঁদের ওপর ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলের প্রয়োগকে সার্থক বলে দাবি করা হয়, তাঁদের মধ্যে একটা বিরাট অংশই এই রকমের সাধারণ চোখে তরে-যাওয়া মানুষই।

তাহলে? সুস্থ বা স্বাভাবিক মন বলতে ওঁরা ঠিক কী বলতে চান? এই প্রশ্ন নিয়ে অবশ্য ওঁদের নিজেদের মধ্যেই অনেক রকমের জটিল আলোচনা আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্তত চিকিৎসা-প্রসঙ্গে বাস্তব পরিবেশটুকুর মধ্যে সুস্থ বা স্বাভাবিক বলতে তাঁরা বোঝেন এমন এক মানসিক অবস্থা যা লাভ করলে পর মূর্ত পারিপার্শ্বিককে—এবং বিশেষ করে বর্তমান সমাজ-সম্পর্ককে— সম্পূর্ণ নিরুৎপাতে ও নির্বিবাদে স্বীকার করে নেওয়া যায়। অর্থাৎ কিনা, পারিপার্শ্বিককে বদল করবার দিকে, সমাজ-সম্পর্কের বর্তমান অনাচার বদলে তাকে সুস্থ ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করবার দিকে, ঝোঁক একেবারেই নয়। তাই, আদর্শের দিক থেকে বা উদ্দেশ্যের দিক থেকে, বিজ্ঞান নয়।

তার বদলে ধর্ম—অভ্রান্তভাবেই ধর্ম। কেননা, ঝোঁকটা একান্তই হলো সহ্য করবার দিকে, কিংবা, আরো খুঁটিয়ে বললে বলা উচিত, সহ্য করবার যে কষ্ট তা ভুলতে শেখার দিকেই।

বিষয়টিকে আরো খুঁটিয়ে বিচার করতে হলে ফ্রয়েডবাদের একটি বক্তব্য বিশ্লেষণ করা দরকার। বক্তব্যটি শুধুই যে ফ্রয়েডবাদের একটি স্থিতিস্তম্ভ তাই নয়, সুস্থ মন বা উপযোজন বলে ব্যাপারকে ফ্রয়েডপন্থীরা এই মূল বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষায়ই বিচার করতে বাধ্য হন। ফ্রয়েড বলছেন, বাস্তব সত্য (matrial reality) মানস সত্য (Psychical reality)—এই দুয়ের মধ্যে তফাত করতে হবে: এবং স্বাভাবিক মনের সংজ্ঞা খুঁজতে এগিয়ে ডাঃ আর্নস্ট জোন্স প্রথমেই বলে রাখছেন: By reality, we can in this connection only mean psychological reality, and this in its turn may be reduced to mental contact with the individuals comprising the particular environment of the subject. (Papers on Psychoanalysis: Concept of a Normal Mind. p. 204). অর্থাৎ কিনা, এই প্রসঙ্গে বাস্তব বলতে শুধুমাত্র মানসিকভাবে বাস্তবকে বুঝতে হবে, যা আবার শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিটির নিজস্ব পারিপার্শ্বিকের লোকজনের সঙ্গে মানসিক সম্পর্ক ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু ব্যাপারটা কী? বাস্তব সত্য আর মানসিক সত্যের মধ্যে তফাত মানে কি? সুস্থ মনের ফ্রয়েডীয় সংজ্ঞাটা শুধুমাত্র মানসিক সত্যের পটভূমিকাতেই বা কেন?

বাস্তব দুনিয়ায় যা রয়েছে, যা ঘটছে, তা সবই হলো বাস্তবভাবে সত্য—ফ্রয়েডের পরিভাষায় material reality। কিন্তু ফ্রয়েড বলেন, আমরা আমাদের মানস সত্তার দিক থেকে

এগুলিকে নিছক বাস্তব বস্তু যা বাস্তব ঘটনা বলে গ্রহণ করি না। অর্থাৎ কিনা, আমাদের মনোজগতের কাছে এগুলির তাৎপর্য সম্পূর্ণ অন্য রকমের। একটা নমুনা নেওয়া যাক। ইতিপূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি—টাকার কথা। নগদ টাকার নিছক টাকা হিসেবে যে মূল্য সেটা হবে বাস্তব সত্যের ব্যাপার—material reality। কিন্তু আমাদের সজ্ঞানে বা সচেতন মনের কাছে কাঁচা টাকা বলে এই জিনিসটা তার বাস্তব সত্যের রূপে প্রতিভাত হলেও আমাদের সমগ্র মানস সত্তার তুলনায় ওই সজ্ঞানের স্থান ফ্রয়েডীয় মতে তো নেহাতই সংকীর্ণ। মানবমন বলতে আসলে যা কিছু তা তো প্রধানতই হলো নির্জ্ঞান বা unconcious আর যদি তাই হয় তাহলে নির্জ্ঞান মন বাস্তব বস্তু বা বাস্তব ঘটনাগুলিকে যেভাবে চিনতে চায়, যে অর্থে গ্রহণ করে, মানস সত্তার দিক থেকে সেইটেই হবে তার আসল রূপ। অর্থাৎ কিনা, মানস সত্য। মানস সত্য হিসেবে ফ্রয়েডপন্থীর কাছে তাই কাঁচা টাকার অন্য একটা তাৎপর্য আছে আর ফ্রয়েড মনে করেন, আমাদের ওই নির্জ্ঞান মন এক অন্ধ ও প্রাকৃত যৌন ক্ষুধা-মাত্র। তাই, এই নির্জ্ঞান মনের সামনে যা কিছুই উপস্থিত হোক না কেন, আমাদের নির্জ্ঞান মন তার একটা যৌন তাৎপর্য খুঁজে বের করে। ফলে মানস সত্যের দিক থেকে ওই তাৎপর্যটাই হয়ে দাঁড়ায় আসল কথা। যেমন ধরুন, বাস্তব সত্যের দিক থেকে যার নাম কাঁচা টাকা মানস সত্যের দিক থেকে তাই হয়ে দাঁড়ায় শুক্রবস্তু বা seminal matter।

মানুষে-মানুষে যে সামাজিক সম্পর্ক তার বেলাতেও ফ্রয়েডপন্থীর এই কথাই। বাস্তব দুনিয়ায় তার একটা বাস্তব তাৎপর্য নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু ফ্রয়েড বলবেন, তার ওই তাৎপর্যটাই একমাত্র তাৎপর্য নয়। অর্থাৎ কিনা আমাদের মানস সত্য এই

সমাজ-সম্পর্কের মানস সত্য বা psychical reality আর ফ্রয়েড বলবেন, মনস্তত্ত্ববিদ্ হিসেবে—বা মনোবিকারের চিকিৎসক হিসেবে—তাঁর একমাত্র দায়িত্ব হবে শুধুমাত্র এই মানস সত্যটুকুর ওপরে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখা।

প্রথমে, ফ্রয়েডের নিজের তরফের কথাটা দেখা যাক। বিজ্ঞানের তো অন্যান্য নানান শাখা আছে। বাস্তব যাথার্থ্যের নানান দিক নিয়ে মাথা ঘামানোর দায়িত্ব এই সব নানান শাখার। ও-সব দায়িত্বের কোনোটাই নিশ্চয়ই মনোবিজ্ঞানের নিজস্ব দায়িত্ব হবে না। তার একমাত্র দায়িত্ব হবে মানসিক সত্য বা psychical reality নিয়ে মাথা ঘামানোর। যেমন ধরুন, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের নানা শাখা নানান দিক থেকে বাস্তব দুনিয়ার বাস্তব অর্থ সংগ্রহ করতে ব্যস্ত। ওই অর্থ সংগ্রহ অবশ্যই মনোবিজ্ঞানের কাজ হবে না। আকাশের মহাশূন্যে বাস্তব গ্রহতারার বাস্তব রূপ আর গতিপথ কী রকম তার রহস্য আবিষ্কার করবার দায়িত্ব জ্যোতির্বিজ্ঞানের, মনোবিজ্ঞান এই প্রসঙ্গে শুধু প্রশ্ন তুলবে ওই গ্রহতারার দল মানবমনে ঠিক কোন্ ধরনের আবেগ-অনুভূতি জাগায়। সমাজ-সম্পর্কের বেলাতেই বা এই কথার কোনো ব্যতিক্রম কেন হবে? মানুষে-মানুষে যে সম্পর্ক তার বাস্তব রূপটা নিয়ে মাথা ঘামাবেন সমাজবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী নিশ্চয়ই নন। মানসিক সত্যের দিক থেকে এর যেটুকু তাৎপর্য শুধু তারই সন্ধান মনোবিজ্ঞানে। তাই, মনোবিজ্ঞানীর কাছে প্রধান প্রশ্ন হলো: ওই তাৎপর্যটা ঠিক কেমনতরো? ফ্রয়েডপন্থী বলবেন, মানস সত্যের স্তরে সব কিছুই যেহেতু নির্জ্ঞান মনের চাহিদা-অনুসারে এক রকমের তর্জমামাত্র, আর নির্জ্ঞান মনের চাহিদাটা যেহেতু শুধুই এক অন্ধ আর প্রাকৃত যৌন ক্ষুধা, সেইহেতু মানস সত্যের দিক থেকে মানুষে-মানুষে

সব রকমের সম্পর্ক শেষপর্যন্ত সাবেকী অর্থ বদল করে তাকে অনেক ব্যাপক এক অর্থে গ্রহণ করতে চান; কিন্তু তাই বলে এই ব্যাপকতর অর্থের মধ্যেও কোনো রকমের সামাজিক সত্য প্রবেশ করতে পারেনি। কেননা, এই অর্থব্যাপ্তি-প্রসঙ্গে তাঁর মূলসূত্র হলো রকমারি কাম বিকারের দৃষ্টান্তই (Three Contributions)। ফলে যৌন-সম্পর্কের অজস্র রকমারিত্ব স্বীকার করে নিয়ে মানুষে-মানুষে যে-কোনো রকম বাস্তব সম্পর্ককে মানস সত্যের দিক থেকে কোনো না কোনো রকমের যৌন-সম্পর্ক বলে বর্ণনা করা ফ্রয়েডপন্থীর কাছে একটুও কঠিন কথা নয়।

ব্যাপারটা কোথায় গিয়ে পৌঁছয় তা আলোচনা করতে হলে একটা চূড়ান্ত নমুনা নেওয়াই ভালো। ধরুন, আপনি মিছিলে যোগ দিয়েছেন, পুলিশে লাঠি চালালো সেই মিছিলের ওপর। এখানে, আপনার সঙ্গে পুলিশের একটা সম্পর্ক ঘটলো। বাস্তবের দিকে থেকে এই সম্পর্কের কী রকম বর্ণনা হবে তা আমরা সহজবুদ্ধির সাহায্যেই বুঝতে পারি। আপনি হয়তো বলবেন: এ সম্পর্ক হলো নির্যাতক-নির্যাতিতের সম্পর্ক। অবশ্যই, কর্তৃপক্ষের ফতোয়ায় এর বর্ণনাটা অন্য রকমের হবে। তাঁরা একে বলবেন, এ-সম্পর্ক হলো উচ্ছৃঙ্খল ও শৃঙ্খলতার প্রতিনিধির সম্পর্ক। কিন্তু ফ্রয়েডপন্থী কী বলবেন? তিনি বলবেন, সম্পর্কটা আসলে আপনার বর্ণনা-অনুমোদিত না কর্তৃপক্ষের বর্ণনা-অনুমোদিত সে-তর্কে তাঁর মন নেই। কেননা, এই দুই বর্ণনার মধ্যে যে-দ্বন্দ্ব তা আসলে বাস্তব সত্যের বাস্তব বর্ণনা নিয়ে দ্বন্দ্ব। সে-দ্বন্দ্বে ফ্রয়েডপন্থীর মত নেই সে-চর্চা তাঁর কাছে পরধর্মের চর্চা। মনোবিজ্ঞানীর নির্দিষ্ট আদর্শ অনুসারে বাস্তব সত্যের বাস্তব বর্ণনা নিয়ে মাথা ঘামানোটাই যে অবান্তর ব্যাপার! তাই মনোবিজ্ঞানী

বিশেষ করে ভাবছেন, নির্জ্ঞান মনের চাহিদা মেনে মানুষের মন এই সম্পর্কটাকে কি কীভাবে বুঝতে চায়? অর্থাৎ কিনা, বাস্তব সম্পর্কটা যে-রকমেই হোক না কেন, নির্জ্ঞানের তর্জমা অনুসারে তার কী রূপ দাঁড়ালো? কিন্তু নির্জ্ঞান মনের কাছে নিছক যৌন ছাড়া আর কোনো রকমের ভাষা জানা নেই। তাই নির্জ্ঞান মন এই সম্পর্ককেও যৌন-সম্পর্কের অর্থেই বুঝতে চায়। কী ধরনের যৌন-সম্পর্ক? ফ্রয়েডপন্থী বলবেন, সমকামী বা homosexual যৌন-সম্পর্ক: সেপাইয়ের পক্ষ থেকে কর্মবৃত্ত বা active, আপনার তরফ থেকে ভোগবৃত্ত বা passive। আ আপনি যদি ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলের সাহায্যে স্বাভাবিক মানুষ হবার চেষ্টা করেন তাহলে ফ্রয়েডপন্থী আপনার মানসিক সমস্যাটা আপনাকে কীভাবে বোঝাতে চাইবেন? তিনি বলবেন, প্রথমত কর্তৃপক্ষের শাসন অমান্য করে এভাবে মিছিলে যোগ দেবার মানসিক তাৎপর্য হলো পিতৃদ্রোহের ভাব প্রকাশ করা: অবশ্য এই রকমের পিতৃদ্রোহেরও একটা যৌন তাৎপর্য আছে, কিন্তু সে-কথা আপাতত থাক। দ্বিতীয়ত, ফ্রয়েডপন্থী বলবেন, আপনার নির্জ্ঞান মনের যৌন তাগিদ (libido) যদি সত্যিই দ্বন্দ্বমুক্ত হয় তাহলে ওই ভোগবৃত্ত সমকামী চরিতার্থতার পক্ষেও সুখভোগ্য হবার পথ খুলে যাবে। অর্থাৎ কিনা, পুলিশের কাছ থেকে লাঠির বাড়ি খেয়ে শারীরিক যন্ত্রণা সত্ত্বেও মোট অভিজ্ঞতাটাকে আপনি সুখভোগ্য বলেই গ্রহণ করতে পারবেন। বস্তুত, সেইটেই হবে স্বাভাবিক বা সুস্থ মনের লক্ষণ। কেননা, সুস্থ বা স্বাভাবিক অবস্থা বলতে মনের সেই অবস্থাই বোঝায় যা লাভ করলে পর সমস্ত রকমের সম্ভবপর যৌন আকাঙ্ক্ষা বাধামুক্ত ও দ্বন্দ্বমুক্ত হয়ে যায় আর তাই সমস্ত রকমের সম্পর্কই হয়ে পড়ে মধুময়। আর তা যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নানান রকম পরিস্থিতিতে

নানা রকমের উত্তেজনা-উৎকণ্ঠার দুঃখ ভোগ করে থাকে। যেমন ধরুন, আপনার নির্জ্ঞানের ভোগবৃত্ত সমকামী যৌন চাহিদা যদি বাধামুক্ত ও দ্বন্দ্বমুক্ত না হয় তাহলে এই জাতীয় পরিস্থিতি বা পরিস্থিতির কল্পনাও আপনার পক্ষে অত্যন্ত ক্লেশকর হবে, কিংবা যা একই কথা, পরিস্থিতিটা গ্লানিকর হচ্ছে কিনা তাই দেখেই অনুমান করা চলবে আপনার নির্জ্ঞান মনে ভোগবৃত্ত সমকামের চাহিদা দ্বন্দ্বমুক্ত হয়েছে কিনা। আপনি হয়তো ঘোরতর নাস্তিকের মতো বলবেন: এ একেবারে আষাঢ়ে কথা, মার খেতে কি সত্যি কারুর ভালো লাগতে পারে নাকি? ফ্রয়েডপন্থী হেসে জবাব দেবেন: তা পারে বই কি? "মারো মারো প্রভু, আরো মারো"—এ গানও তো মানুষের গলাতেই শোনা গিয়েছে, আর ভোগবৃত্ত সুখানুভূতির পথ একেবারে বাধামুক্ত না হলে পর এই গানের পেছনে যে-আবেগ তার উৎস কেমন করে ব্যাখ্যা করবেন বলুন?

দৃষ্টান্তটা অবশ্যই একেবারে চরম দৃষ্টান্ত হলো। কিন্তু কোনো একটি মতবাদকে বিচার করতে হলে, তার আসল দাবিটা ঠিক কী রকম তা স্পষ্টভাবে চিনতে হলে, একেবারে চরম দৃষ্টান্তের শরণাপন্ন হওয়াই সবচেয়ে সুবিধের। তাই এই দৃষ্টান্তটিকে বিচার করেই উপযোজন কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য আপনি সহজে চিনতে পারবেন। ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলের আসল চেষ্টাই হলো, রোগীর সামনে তার নির্জ্ঞান মনের সমস্ত চাহিদাগুলিকে ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটন করে এগুলিকে বিনা দ্বন্দ্বে গ্রহণ করতে শেখানো; এইভাবে যৌন পরিস্থিতির সমস্ত সম্ভাবনা বাধামুক্ত হলে পর জীবনের সমস্ত পরিস্থিতিই তার কাছে মধুময় হয়ে উঠবে—কোনো অবস্থাই তাকে আর পীড়িত করবে না, উৎকণ্ঠিত করবে না।

ওই অন্ধ যৌন তাগিদের কথা কতোখানি বাস্তব সে-আলোচনা স্বতন্ত্র; এখানে তার অবতারণা করতে গেলে মূল আলোচনা ছেড়ে অন্যদিকে অনেকখানি এগিয়ে যেতে হবে। আপাতত দেখুন, ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলের এই আদর্শটিকে ধর্মের আদর্শ বলবেন না, বিজ্ঞানের আদর্শ বলবেন। এর পেছনে যদি বহির্বাস্তবকে বদল করবার, প্রকৃতিকে জয় করবার এতোটুকুও আগ্রহ থাকতো তাহলে একে বিজ্ঞানের সমগোত্র বলবার সুযোগ হয়তো পাওয়া যেতো। কিন্তু যেহেতু এই কৌশল বহির্বাস্তবকে সবচেয়ে নিরুপদ্রবে সহ্য করবার উদ্দেশ্য ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্যকে আমল দিতে পারে না সেইহেতু একে একান্তভাবেই ধর্মপদবাচ্য বলতে হবে। আর ওই হলো ফ্রয়েডের অন্তর্দ্বন্দ্ব: ধর্মকে তিনি বলছেন পাঁচ রকম palliative remedy—মাদকদ্রব্যের মতোই জীবনের জ্বালা ভোলবার একটা উপায়। অথচ, তাঁর নিজের এই কলাকৌশলও শেষ পর্যন্ত একরকম palliative remedy ছাড়া আর কিছুই হতে পারলো না! তাহলে, পরলোক থেকে প্রত্যাশা প্রত্যাহার করে বিজ্ঞান-নির্ভর সুস্থ পরিবেশে সুখের জীবন নিয়ে তিনি যে-উক্তি করেছিলেন তা কি নেহাতই কথার কথা হয়ে দাঁড়ালো?

অবশ্যই, ধর্মের মামুলি রূপ এটা নয়। তাহলে তো সহজেই ধর্ম বলে চিনতে পারা যেতো। তার বদলে ধর্মের নবকলেবর—অনেক সূক্ষ্ম, অনেক সভ্য, অনেক মার্জিত এর রূপ, তাই বিজ্ঞানের ছদ্মবেশে চলে যায়, খটকা লাগে না। বিশেষ করে বিজ্ঞানস্তুতির আড়ালে পেশ করলে পর একে ধর্ম বলে চিনতে পারাই কঠিন। কিন্তু তবু কলেবরের তফাত হলেই তো আর মৌলিক তফাত হয়ে যায় না। লেনিন যেমন গোর্কিকে লিখেছিলেন, ধর্মের সেকেলে স্থূল রূপটার সঙ্গে গণতন্ত্র-স্বীকৃত

সূক্ষ্ম রূপটার তফাতটা আসলে হলুদ-বরন ভূত আর নীল-বরন ভূতের মধ্যেকার তফাতের মতোই। ভূতুড়ে গল্প হিসেবে ধর্মের স্থূল রূপটার চেয়েও সূক্ষ্ম ও মার্জিত রূপটাই অনেক বেশি বিপজ্জনক: প্রথমটিকে আপনি এক-নজরেই ধর্ম বলে চিনতে পারবেন, তার স্থূল কদর্যতায় বিরূপ হবে আপনার মন: কিন্তু সূক্ষ্ম রূপে ধর্মের যে-বিকাশ তার বিপদ সম্বন্ধে হুঁশিয়ার থাকা অনেক বেশি কঠিন। লেনিন বলেছেন: The crowd is much more able to see through millions of *Physical* sins, dirty tricks, violences and infections which are therefore much less dangerous than is the *subtle* spiritual idea of the little god arrayed in the smartest of "ideological" costumes. A Catholic priest who violates young girls (about whom I happened to read just now in a German newspaper) is much less dangerous to "democracy" than are priests who do not wear surplices, priests without vulgar religion, ideolocial and democratic priests, who preach the creation, and making of little gods. The first type of priests can be early exposed, condemmed and driven out but the second cannot be driven out so simply. It is a thousand times more difficult to expose him since not a single "frail and pitifully weak" philistine will agree to "condemn" him. Religion: Lenin, p. 70).

বাস্তব জগতের বাস্তব সমাজ-সম্পর্কের পরিবর্তন প্রসঙ্গ এড়িয়ে ফ্রয়েডপন্থীও যখন অতিপ্রাকৃত এক অন্ধ যৌন তাড়নার

গল্প শুনিয়ে এই বাস্তব পরিবেশকেই কোনোমতে সইতে শেখবার পথনির্দেশ করেন তখন তাঁর ওই বন্ধ ঘরের রহস্যঘন কায়দাকানুনকে আপাতত যতোই রোমাঞ্চকর বিজ্ঞান বলে ভ্রম হোক না কেন, ভুললে চলবে না তিনি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সমাজের ধড়াচূড়োহীন পুরুতঠাকুরই—পুরোহিতের আদর্শের সঙ্গে তাঁর প্রকৃত আদর্শের তফাত নেই যে!

অবশ্যই ফ্রয়েডপন্থী তর্ক তুলে বলতে পারেন, এমনতরো আপত্তির কোনো অর্থ হয় না। মনোবিজ্ঞানীর সমস্যাটা মানস সত্য ছাড়া আর কিসের সমস্যা হতে পারে? বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সমস্ত কর্মীর কাজই তো আর এক নয়। পদার্থবিজ্ঞানী কেন চিকিৎসাবিজ্ঞানের সমস্যা সমাধান করছেন না—এমনতরো আপত্তি নিশ্চয়ই মূর্খতাবাচক। তেমনি, মনোবিজ্ঞানী শুধুমাত্র মানস সত্য নিয়ে মাথা ঘামান বলে তাঁর চেষ্টাকে ধর্মপদবাচ্য বলে ঘোষণা করাটাও শিক্ষিত মনের পরিচয় নয়। ফ্রয়েডপন্থী নিশ্চয়ই বলবেন, মনোবিজ্ঞানী যদি মনোবিজ্ঞানী না হতেন তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর পক্ষেও সমাজ-সম্পর্ক ও বাস্তব পরিবেশকে বদল করবার প্রশ্ন উঠতে পারতো। কিন্তু সে-কথা তুলে তো আর লাভ নেই। বরং মনোবিজ্ঞানী যদি ওই ধরনের ভয়াবহ পরধর্মচর্চা করতে যেতেন তাহলেই তাঁর বিরুদ্ধে আদর্শ বিচ্যুতির অভিযোগটা প্রাসঙ্গিক হতো। তাছাড়া, ফ্রয়েডপন্থী হয়তো আরো বলবেন, উপরোক্ত আপত্তিটা যদি ঠিক হয় তাহলে তো মনোবিজ্ঞান কোনোকালেই বিজ্ঞান হতে পারবে না। কেননা, বহির্বাস্তবের পরিবর্তন-প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে শুধু মানস সত্তার পরিবর্তন-প্রসঙ্গ উত্থাপন করাই যদি ধর্মমোহের লক্ষণ হয়, তাহলে স্বধর্ম বর্জন ছাড়া মনোবিজ্ঞানীর পক্ষে যে এই তথাকথিত ধর্মমোহের পথ থেকে ফিরে আসবার কোনো উপায়ই নেই। কেননা, মনোবিজ্ঞান

যেহেতু নেহাতই মনোবিজ্ঞান সেইহেতু শুধু মানস সত্তার আলোচনাই তার পক্ষে স্বধর্ম।

এই আপত্তির পুরো জবাব দিতে হলে মনোবিজ্ঞানের প্রকৃত রূপ নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা তুলতে হয়। আর সেই আলোচনা-প্রসঙ্গে যে মূল প্রশ্ন ওঠে, সেটা হলো: মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে কি সত্যিই বিজ্ঞানের পথ খুঁজে পাওয়া গিয়েছে, সম্ভব হয়েছে কি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ? অর্থাৎ কিনা, মনোবিজ্ঞান কি সত্যিই পেয়েছে বিজ্ঞানের মর্যাদা? যদি খাপছাড়াভাবে ঘোষণা করা হয় যে মনোবিজ্ঞান এখানো প্রকৃত বিজ্ঞানের মর্যাদা সত্যিই পায়নি, তাহলে নিশ্চয়ই অর্বাচীনতার অপবাদ জুটবে, বাস্তব পরিস্থিতিটা সত্যিই এর চেয়ে খুব কিছু আশাপ্রদ নয়। ধর্মমোহ আর দার্শনিক কল্পনার গণ্ডি পেরিয়ে মনোবিজ্ঞান প্রকৃত বিজ্ঞানের পর্যায়ে পৌঁছতে পেরেছে কিনা তা সত্যিই আজো বিচার-সাপেক্ষ প্রশ্নই। গ্রন্থান্তরে এই প্রশ্ন নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা তুলেছি ("পুরোনো প্রশ্ন আর নতুন পৃথিবী" দ্রষ্টব্য)। আর সেই প্রসঙ্গেই দেখাবার চেষ্টা করেছি, মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পাভ্‌লভের আবিষ্কার যে বৈপ্লবিক পথ খুলে দিয়েছে, একমাত্র সেই পথ অনুসরণ করলেই মনোবিজ্ঞানের পথে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক মর্যাদা পাবার আশা। আর মনোবিজ্ঞানে এই যে বিপ্লব এর মূল কথা হলো, মানস সত্তাকে বাস্ব-পরিবেশ নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক রূপে চিনতে যাওয়াটাই ভুল, কেননা রক্তমাংসে গড়া এই মানুষ একান্তভাবেই বাস্তব পৃথিবীর অঙ্গ এবং তার স্নায়ুতন্ত্রের উপর বাস্তব প্রকৃতির নিয়ত প্রভাবই তার মানস সত্তার প্রকৃত রূপ! অথচ, প্রাক্-পাভ্‌লভ মনোবিজ্ঞানের মূল কথাটা একেবারে অন্য—মানস সত্তাকে বাস্তব-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ সত্তা বলে চেনবার চেষ্টা। কেননা, প্রাক্-পাভ্‌লভ মনোবিজ্ঞানের চোদ্দ আনা

প্রেরণাই হলো প্লেটনিক ভাববাদের প্রেরণা। অবশ্য এইখানে ওই আলোচনার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন, তাছাড়া তাতে মূল আলোচনার খেই হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা। কেবল, অর্বাচীনতা-অপবাদের প্রতিবাদে বৃদ্ধসম্মতি হিসেবে পাভ্‌লভের নিজের উক্তি উদ্ধৃত করা যায়:

At the beginning of our work and for a long time afterwards we felt the compulsion of habit in explaining our subject by psychological interpretation. Every time the objective interpretation met an obstacle...there arose quite naturally misgivings as to the correctness of our new method. Gradually with the progress of our research these doubts appeared more rarely, and now I am deeply irrevokably convinced that along this path will be found the final triumph of the human mind over its uttermost and supreme problem-the knowledge of the mechanism and laws of the human nature...Let the mind rise from victory to victory over surrounding nature, let it conquer for human life and activity not only the surface of the earth but all that lies between the depths of the sea and the outer limits of the atmosphere, let it command for its service prodgious energy to flow from one part of the universe to the other, let it annihilate space for the transference of its thought, yet the same

human creature, led by dark powers to works and revolutions and their horrors, produces for itself incalculable material losses and inexpressible pains and reverts to bestial conditions. Only science, exact science about human nature itself, and the most sincere approach to it by the aid of the omnipotent scientific method, will deliver man from its present gloom, and will purge him from his contemporary shame in the sphere of inter-human relations (Lectures on Conditioned Reflexes, p. 41).

মনে রাখতে হবে, objective method বলতে এইখানে পাভ্‌লভ তাঁর conditioned reflex পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন, যে-পদ্ধতির মূল কথাই হলো: মানস সত্তাকে বাস্তব পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করবার চেষ্টাটাই ভ্রান্ত। আর এইদিক থেকেই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় ফ্রয়েডবাদের মূল প্রতিজ্ঞা হলো মানস সত্যকে বাস্তব সত্য থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করে নিতে হবে এবং মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিকে একান্তভাবেই নিবদ্ধ রাখতে হবে ওই মানস সত্যটুকুর উপরে। ঠিক এইখানেই, ফ্রয়েডবাদের বিজ্ঞান-বিরোধী উৎসাহের আসল বীজ! আর বিজ্ঞানের ভিত্তি হারিয়ে ফ্রয়েডবাদের বিজ্ঞান-বিরোধী উৎসাহের আসল বীজ! আর বিজ্ঞানের ভিত্তি হারিয়ে ফ্রয়েডবাদ শুধুই যে রকমারি পৌরাণিক কল্পনায় বিভোর হয়েছে তাই নয়, মানুষের ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে দেখেছে শুধুই গভীর অন্ধকার। বিজ্ঞানের উপর দৃঢ় আস্থা পাভ্‌লভের কণ্ঠে যে আশার বাণী জাগিয়েছে তার পাশাপাশি ফ্রয়েডের কথাগুলি তুলনা করে দেখুন। ফ্রয়েড বলছেন :

... What would be the use of the most acute analysis of social neuroses, since no one possesses the power to compel the community to adopt the therapy? ...My courage fails me, therefore, at the thought of rising up as a prophet before my fellow-men, and I bow to their reproach that I have no consolation to offer them, (Civilization and its Discontents. pp. 142-143).

অর্থাৎ কিনা, পুরো সমাজটা যে-মনোবিকারে ভুগছে তার চরম বিশ্লেষণ করেও কোনো লাভ নেই, কেননা এই রোগের যে-চিকিৎসা তা সমাজকে গ্রহণ করতে বাধ্য করবার মতো শক্তি কারুরই নেই। অতএব, আবার স্বজনদের সামনে কোনো এক অবতারের মতন উঠে দাঁড়াবার সাহস আমার হয় না এবং তাঁদের কোনো সান্ত্বনার বাণী শোনাতে আমি সত্যই অসমর্থ—এর দরুন যে-নিন্দা তা আমি মাথা পেতে গ্রহণ করছি।

মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই হলো ফ্রয়েডের চরম কথা। আর এই হতাশাকে যে-কোনো আখ্যা দিন না কেন, একে বিজ্ঞান কিছুতেই বলা চলে না। কেননা, বিজ্ঞানের আসল আদর্শটাই যে একেবারে অন্য আদর্শ : মূর্ত পৃথিবীর সঙ্গে সংগ্রামে এগিয়ে মানুষের জন্যে শান্তি আর স্বাচ্ছন্দ্য: অর্জনের আদর্শ। অবশ্যই এ-কথা ঠিক যে শুধু মাত্র জড়জগৎকে জয় করতে পারলেই মানুষের সুখ শান্তি পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। তাই ফ্রয়েড যখন শুধু এ-কথাটা বলেন তখন তাঁকে বিজ্ঞান-বিরোধী বলবার তাগিদ থাকে না। এ-কথা পাভ্‌লভও স্বীকার করেন এবং কেন যে তা সত্যি তার ব্যাখ্যা দিয়ে এঙ্গেলস্‌ বলেন, মানুষের সমস্যা তো

শুধুই জড়জগতের প্রাকৃতিক শক্তিকে জয় করবার সমস্যাটুকু নয়, এই প্রকৃতিরই অন্তর্গত মানুষে মানুষে যে সমাজ-সম্পর্ক তার আইনকানুনও স্পষ্টভাবে চিনতে পারা এবং ওই জ্ঞানের ভিত্তিতে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা। নিছক বহিঃপ্রকৃতির আইনকানুনকে অনেকখানি চিনতে, ও চেনবার ভিত্তিতে জয় করতে শিখেও মানুষ এখনো সেই অনুপাতেও সুখের আনন্দের অধিকারী হতে পারেনি, কেননা সমাজ-সম্পর্কের আইনকানুন সম্বন্ধে মানুষের চোখ ফোটেনি সেই অনুপাতে।

But even in this sphere, by long and often cruel experience and by collecting and analysing historical material, we are gradually learning to get a clear view of the indirect, more remote, social effects of our productive activity, and so the possibility is afforded us mastering and controlling these effects as well. (Engels: Dialectics of Nature, p. 294).

সমাজ-সম্পর্কের মৌলিক পরিবর্তন যে মানবচরিত্রে মৌলিক পরিবর্তন সাধন করবে এবং তারই ফলে মানুষের সামনে যে খুলে যাবে অসীম ভবিষৎ—এ-বিশ্বাস থেকে পাভ্‌লভের পক্ষে বিচ্যুত হবার প্রশ্ন ওঠেনি, কেননা মানবচরিত্রকে বা মানস সত্যকে তিনি বাস্তব-নিরপেক্ষ বিশুদ্ধ কিছু বলে কল্পনা করেননি। তাই দেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে অমন বলিষ্ঠ অভিনন্দন জানানো তাঁর পক্ষেই সম্ভব হলো:

As you know, I am an experimenter from head to foot. Our government is also an experimenter. only on an incomparably higher plane. I passionately desire to live in order to

see the victorious completion of this historical social experiment. (Conditioned Reflex and psychiatry, p. 33).

ফ্রয়েডের পক্ষে কিন্তু অতো বড়ো বৈজ্ঞানিক মহাপরীক্ষা থেকেও বিশেষ কিছু আশা-ভরসা পাবার প্রশ্ন ওঠে না, কেননা, মানব-স্বভাবটা তাঁর কাছে এক নিরবলম্ব মানস সত্যমাত্র আর তাই বাস্তব সমাজ-সম্পর্কের কোনো রকম পরিবর্তনই এই বিশুদ্ধ মানস সত্যটির উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

I too think it unquestionable that an actual change in men's attitude to property would be of more help in this direction than any ethical commands: but among the socialists this proposal is obscured by new idealistic expectations disregarding human nature which detract from its value in actual practice (Civilization and its Discontnts. pp. (140-41).

ফ্রয়েডীয় মতে, সমাজতান্ত্রিক কর্মী যে-মানবপ্রকৃতির কথা ভুলে যাচ্ছেন তার স্বরূপটা কী রকম? ফ্রয়েড বলবেন, মূলতই জিঘাংসাময় তার রূপ আর বাস্তব পরিবেশের কোনো রকম অদল-বদল করেই মানবপ্রকৃতির এই রূপটাকে বদল করবার সম্ভাবনা নেই। কেননা, মানবপ্রকৃতি তো ফ্রয়েডীয় মতে বাস্তব পরিবেশের ওপর একটুও নির্ভর করে না। তাই পরিবেশকে বদল করা গেলে সনাতন মানবপ্রকৃতি নবরূপে আত্ম-চরিতার্থতা খুঁজবে মাত্র। ফ্রয়েড যে-রকম বলছেন:

... the attempt to establish a new communistic type of culture in Russia should

find psychological support in the persecution of the bourgeois. One only wonders with some concern, however, how the Soviets will manage when they have exterminated their bourgeois entirely. (Ibid. p. 91).

বলাই বাহুল্য, আজকের দিনে বিশ্বশান্তি-শিবিরের অমন বলিষ্ঠ নেতৃত্ব যার উপর তার সম্বন্ধে ফ্রয়েডের এই কল্পনা শুধুই হাস্যের উদ্রেক করে। কার উপর রুশদের তার জিঘাংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবে? কারুর উপরই নয়, কেননা ওই জিঘাংসা প্রবৃত্তির কথাটাই যে অতিকথা-মাত্র! তার বদলে আমরা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি গঠনমূলক পরিকল্পনায় রুশ সমাজের আজ কী অদম্য উৎসাহ, কী অপরূপ অবদান; তুষারঢাকা মরুভূমির উপর ওরা সোনালী ফসলের বন্যা বওয়াচ্ছে, ভল্‌গা-ডন খাল খুঁড়ে ওরা বদলে দিচ্ছে দেশের ভৌগোলিক লক্ষণ! অথচ, ওই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে পর্যন্ত ওদের মানসিক সত্তা মোটেই এ-রকমের ছিলো না। কিন্তু পাভ্‌লভের মনোবিজ্ঞান অনুসারে, মানসিক সত্তাটা নির্ভর করে বাস্তব পরিবেশের ওপর আর তাই প্রাক্‌-বিপ্লবী নিরন্ন ও গ্লানিময় রুশ চরিত্রের দিকে চেয়েও পাভ্‌লভ দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করতে পেরেছিলেন:

When the negative features of the Russian character-laziness, lack of enterprise, and even slovenly relations to every vital work-provoke melancholy moods, I say to myself, No, these are not real qualities, the are only the veneering, the damning inheritance of Slavery. It made a parasite of the master... and it left

the reflex of purpose without exercise in the fundamental habits of living. Of the slave it made a completely passive creature, without any vital perspective: for continually in the way of his most natural aspirations arose an insurmountable obstacle in the form of the powerful egoism and caprice of his master. But I venture further: a spoiled appetite and poor nutrition may be restored by careful regime and special hygiene. The same can and should happen with the reflex of purpose which has been suppressed during Russia's history. (Lectures on Conditioned Reflex, pp. 280-81).

এই আলোচনা অবশ্যই দীর্ঘতর হতে পারে। পাভ্‌লভের বিপ্লবীপন্থা অনুসরণ করে মনোবিজ্ঞানকে প্রকৃত বিজ্ঞানের মর্যাদা দিতে পারলে মানবকল্যাণ-সাধনে তার অবদান কী অসীম হওয়া সম্ভব তারই আলোচনা। আপাতত সে-আলোচনা স্থগিত থাক; *পুরোনো প্রশ্ন আর নতুন পৃথিবী* বলে বইতে এ-আলোচনা খুঁটিয়ে করেছি।

উপস্থিত, ফ্রয়েডীয় উপযোজন বলে ব্যাপারটির বিশ্লেষণ শেষ করা যাক। ধর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভাববাদী গণ্ডির মধ্যে অমন একান্তভাবে আবদ্ধ থেকে ফ্রয়েডের অমন জমকালো কলাকৌশল কি মানবপ্রকৃতির কোনো বাস্তব পরিবর্তন সাধন করতে সত্যিই অক্ষম হয়? কেমন করে হবে? বাস্তব সত্য থেকেই যে মানস সত্যের জন্ম, বাস্তব সত্যের ওপরই যে মানস সত্যের নির্ভর, বাস্তব সত্যের প্রসঙ্গ সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়ে তাই, শুধুমাত্র মানস সত্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে যাবার চেষ্টাটাই যে

গোড়া কেটে আগায় জল ঢালবার মতো। কিংবা, বলা যায়, যেন ভিত্তি বাদ দিয়ে বাড়ি গড়বার চেষ্টা। সে বাড়ি স্বভাবতই তাসের ঘরের মতো। ফুঁ দিলে পড়ে যায়, এমন দুর্বল। কেবল হয়তো ধ্বসে পড়বার যন্ত্রণাটা টের পাওয়া যায় না। ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলের ওইটুকুই হলো আসল কথা। কিন্তু তার মানে palliativeremedy ই। আফিমের মতো, কোকেনের মতো।

তাসের বাড়িটা যে কী রকম তার একটা নমুনা দেখা যাক। ১৯৩১ সালে আর্নস্ট জোন্স-এর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তার শিরোনাম হলো: The Concept of a Normal Mind। অর্থাৎ কিনা, স্বাভাবিক মন বলতে কী বোঝায় ফ্রয়েডীয় দৃষ্টি-কোণ থেকে তারই আলোচনা। মনে রাখা দরকার, স্বয়ং ফ্রয়েডকে বাদ দিলে ফ্রয়েড-গোষ্ঠীর কাছে জোন্স হলেন মনঃসমীক্ষণের মহাগুরু এবং স্বাভাবিক মনের সংজ্ঞা-নিরূপণ-ব্যাপারে এই প্রবন্ধই মনঃসমীক্ষণ-সাহিত্যের সবচেয়ে বড়ো সম্পদ। আর এই প্রবন্ধে জোন্স নিজেই স্বীকার করছেন: "we have no experience of a completely normal mind"—সম্পূর্ণ স্বাভাবিক মনের পরিচয় ওঁরা কোথাও পাননি (Papers on Psychoanalysis. p. 216)। ইতরসাধারণের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেলো, কিন্তু জোন্‌স্ বলছেন, মহাপুরুষদের মধ্যেও নয়। ডারউইন, ফ্যারাডে, ফ্রয়েড, গেটে, হাক্‌স্লি, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, নেপোলিয়ান, শেক্সপীয়র, ওয়াশিংটন—জোন্স-এর মতে কারুর চরিত্রেই সম্পূর্ণ স্বাভাবিকত্বের পরিচয় নেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো মনঃসমীক্ষণের ওই "আশ্চর্য" কৌশল, ওর সাহায্যেও কি মানুষের মনকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক করে তোলবার কোনো কায়দা হয় না? আর এই প্রশ্নটা খুবই জরুরী প্রশ্ন না হয়ে পারে না। কেননা, পদ্ধতিটা

তো সত্যিই ছেলেখেলার ব্যাপার নয়। অত্যন্ত দীর্ঘ আর অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ এক পদ্ধতি। সময় এবং অর্থব্যয়ের দিক থেকে রোগীকে তো প্রায় দেউলে করে দেবার জোগাড়। আর অতো করেও যদি মনটা প্রকৃত স্বাভাবিকের মর্যাদা না পেলো তাহলে কিসের অমন ঢাকঢোল, অতো জাঁকজমক? অথচ জোন্স হতাশকণ্ঠেই স্বীকার করেছেন -impartial observer cannot fail to be struck by the disconcerting fact that analysed people, including psychoanalysts, differ surprisingly little from unanalysed people in the use made of their intelligence. (Papers on Psychoanalysis. p. 207).

বিচারবুদ্ধির উপযুক্ত প্রয়োগশক্তিকে, রাগদ্বেষহীন, নির্মল বিবেচনা-শক্তিকে নিশ্চয়ই সুস্থ মনের পরিচয় বলে মানতে হবে। তা যদি মানতেই হয় তাহলে স্বীকার না করে উপায় কি যে ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলের সাহায্যে মন সত্যিই স্বাভাবিক হয়ে ওঠে না—অর্থাৎ ওই কলাকৌশল নিয়ে যতোই রহস্যসৃষ্টি করা হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত ওর দশা তাসের ঘরের মতো। জোন্স নিজেই স্বীকার করছেন:

Analysts and other analysed persons often continue to hold heartedly the same convictions and to employ in support of them the same rationalized arguments as unanalysed people in such matters of political controversy: the sacrosanctity of private property and the capitalistic system, or, on the other hand. the panacea of communism; the relative advantages of free trade and tariffs; ... in

varying attitudes towards the manifold fields of art; in feelings about fashions and differences in social class; in the conventional estimates of historical and political personages and events; in the important spheres of national prejudices and convictions; in views about foreign problems (the relation of one's own country to others). Ibid, p. 208).

—অর্থাৎ, এককথায়, ফ্রয়েডীয় কলাকৌশল যাঁরা প্রয়োগ করে থাকেন এবং যাঁদের উপর এ-কৌশল প্রয়োগ করা হয় তাঁরা সকলেই 'ইতর-সাধারণের" মতোই রাজনীতি, শিল্প, সমাজতত্ত্ব প্রকৃতি বিষয়ে নিজেদের রাগদ্বেষ ও সংস্কার অনুসারেই উত্তেজিত তর্ক-বিতর্ক করে থাকেন এবং গোঁড়ামি পোষণ করে রাখেন।

অবশ্যই, ফ্রয়েডবাদীরা এই নিরুপায়ত্বেরও এমন এক ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন, যাতে তাঁদের নিজেদের গায়ে কোনো আঁচড় না পড়ে। জোন্স যেমন বলছেন, এ-পর্যন্ত কারুর উপরই যে একেবারে মনের সাধ মিটিয়ে ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলের প্রয়োগ করা সম্ভব হয়নি। অর্থাৎ কিনা, ওঁদের ভাষায়, কোনো ব্যক্তিকেই একেবারে গভীরতর স্তর পর্যন্ত মনঃসমীক্ষণ করা যায়নি। তা যদি যেতো তাহলে তিনি কতোখানি পর্যন্ত রাগদ্বেষ এবং মোহ-সংস্কার থেকে মুক্তি পেতেন তা দেখতে পাওয়া নিশ্চয়ই চিত্তাকর্ষক হতো। কিন্তু, হায়, ফ্রয়েডপন্থীর নিজের স্বীকৃতি অনুসারেই যে তা সম্ভব নয়! জোন্স বলেছেন: But who would bell the cat? Who is himself sufficiently objective and well-informed to undertake such a

task? অর্থাৎ, ও-কথা ভেবে লাভ নেই। কেননা, মনঃসমীক্ষণ-পদ্ধতির অমন আদর্শ প্রয়োগ করতে পারবেন এমনতো কোনো যোগ্য ব্যক্তির কথাই ভাবা যায় না।

তার মানে, মোদ্দা কথায় ফ্রয়েডপন্থীর নিজস্ব স্বীকৃতি অনুসারেই ফ্রয়েডীয় কৌশলের সাহায্যে সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক মানসিক অবস্থা পাবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। আর, তাঁদের এই স্বীকৃতিকে জরুরী করা হিসেবে উল্লেখ করতে চাই—-অসম্ভাবনার একটা জুতসই কারণ কল্পনা করে তাঁরা যেভাবে নিজেদের চামড়া বাঁচাতে চান সেইটাই আসলে বড়ো কথা নয়। কেননা আসল কারণটার কথা তো আমরা আগেই আলোচনা করেছি: বাস্তব সত্য থেকে তথাকথিত মানস সত্যকে অমনভাবে ছিঁড়ে নিয়ে যে-ঘর বাঁধবার চেষ্টা সে-ঘর যে তাসের ঘরের মতোই। গোড়া কেটে আগায় জল ঢেলে লাভ নেই বনিয়াদ বাদি দিয়ে ইমারত গাঁথবার চেষ্টায়।

যে কায়দাটি হলো ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলের প্রধান কেন্দ্র তার নাম দেওয়া হয় free association method বা অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতি। ফ্রয়েড নিজে এই পদ্ধতিটির উপর কতোখানি জোর দিতে চান তা বোঝা যাবে তাঁর অকুণ্ঠ ঘোষণা থেকে। তিনি বলছেন,----একাধিকবার বলছেন,-—সম্মোহন বা hypnotism-এর উপর নির্ভরতা ছেড়ে যখন থেকে তিনি এই অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতির উপর নির্ভর করতে শিখলেন তখন থেকেই মনঃসমীক্ষণ প্রকৃত অর্থে বিজ্ঞানের মর্যাদা পেলো, বা, যা একই কথা, জন্ম হলো মনঃসমীক্ষণ-বিজ্ঞানের। তাই, যে স্তম্ভের উপর ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলের চরম নির্ভরতা তা ওই অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতিই। আর, প্রথম নজরে এই পদ্ধতিকে সত্যিই বিজ্ঞান-প্রাণ বলে মনে হয়। কেননা সমস্ত বিজ্ঞানের পিছনেই যেটা মূল স্বীকৃতি আপাত-নজরে মনে হয় তাই হলো এই অবাধ অনুষঙ্গের প্রাণবস্তু। সেই মূল স্বীকৃতিটা কী রকম? কার্যকারণবাদের উপর একান্ত নিষ্ঠা। অর্থাৎ কিনা, কোনো ঘটনাই অকারণে ঘটতে পারে না, দৈবাৎ বলে শব্দটি সত্যিই অর্থহীন। নিউটন যদি মনে করতেন, পাকা ফলটা মাটির দিকে অকারণেই পড়ে, কিংবা পাস্তুর যদি মনে করতেন শব্জির রস কখনো দৈবাৎ গেঁজে যায় আবার কখনো দৈবাৎ গেঁজে না—তাহলে নিশ্চয়ই নিউটন বা পাস্তুরের পক্ষে অমন আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কোনো দিনই সম্ভব হতো না। সমস্ত বিজ্ঞানের বেলাতেই, প্রত্যেক

আবিষ্কারের পেছনেই, তাই কার্যকারণবাদের উপর অকুণ্ঠ আস্থা। অবশই অতি-আধুনিক যুগে গভীর সমাজ সংকটের প্রতিবিম্ব যখন বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিকে আবিল করছে তখন তাঁরা, বা তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ, এই দার্শনিক মতবাদের দিক থেকে এই কার্যকারণবাদটি সম্বন্ধেই আস্থা হারাবার উপক্রম করছেন। কিন্তু ওই লক্ষণটা হলো বিজ্ঞানের উপরই আস্থা হারাবার লক্ষণ, সামাজিক অনিশ্চয়তার প্রতিবিম্বই। মার্কসবাদের তরফ থেকে এই আলোচনা ইতিপূর্বে যোগ্যতর সমালোচকেরা সমাধা করেছেন। তাই তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন হবে। আপাতত, ওই কার্যকারণবাদকেই বিজ্ঞানের স্থিতিস্তম্ভ হিসেবে গ্রহণ করেই দেখা যাক, ফ্রয়েডীয় অবাধ অনুষঙ্গ কৌশলটির পিছনে কীভাবে এই কাযকারণবাদের উপর অকুণ্ঠ নিষ্ঠা-স্থাপনের চেষ্টা, অথচ শেষ পর্যন্ত ঠিক কেমনভাবে বিজ্ঞানবিরোধী কল্পনার খাল খুঁড়ে এই কার্যকারণবাদকেই ভাসিয়ে নিয়ে যাবার আয়োজন। অর্থাৎ কিনা এই দিক থেকেও ফ্রয়েডবাদকে বুর্জোয়া অন্তর্দ্বন্দ্বে কণ্টকিত বলে চিনতে ভুল হয় না। কেননা, বিজ্ঞানের প্রতি বুর্জোয়ার যে-ভঙ্গি তার স্বরূপটাও কি এই রকমই: একদিকে সমাজ-ব্যবস্থার কাঠামো চূর্ণ করে উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণী যখন নতুন আর উন্নত সমাজ ব্যবস্থা গড়তে আগুয়ান হয়েছে, তখন এই বিজ্ঞানই তার হাতে সবচেয়ে বলিষ্ঠ হাতিয়ার। আবার অপর দিকে এই বিজ্ঞানই যখন এমন এক প্রচণ্ড শক্তির রূপ নিলো যে-শক্তিকে ওই বুর্জোয়া-ব্যবস্থার কাঠামোর মধ্যে পুরে রাখা অসম্ভব, তখন রহস্যবাদ আর অনির্দেশ্যবাদের জঞ্জাল চাপিয়ে দিয়ে তার শক্তিকে খর্ব করবার ব্যর্থ আয়োজন। ফ্রয়েডীয় অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতির বেলাতেও ঠিক এরই প্রতিবিম্ব: মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সামন্ততান্ত্রিক সংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পটভূমিকায় মনঃ

সমীক্ষণ-পদ্ধতি কার্যকারণবাদকে মজবুত হাতিয়ার হিসেবেই গ্রহণ করতে চেয়েছে, অথচ মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই কার্যকারণবাদে বিশ্বাস যখন এমন এক তাৎপর্য নিয়ে প্রতিভাত হতে চায়, যা কিনা বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থারই চরম সমালোচনা হয়ে দাঁড়াবার উপক্রম করে, তখন ভাববাদী দর্শন আর আদিম পৌরাণিক কল্পনা ঝেঁটিয়ে অজস্র জঞ্জাল সংগ্রহ করে আনে তাকে রহস্যবাদের রূপে রূপান্তরিত করবার আয়োজনে।

তাই, অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতিকে খুঁটিয়ে বিচার করা দরকার: ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলের ওই চরম ভিত্তিটুকুর মধ্যেই তার অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকটতম বিকাশ। প্রথমে দেখা যাক, এই অনুষঙ্গ পদ্ধতিটির পিছনে বিজ্ঞান-নির্ভরতার পরিচয়টা ঠিক কী রকম। তার থেকেই বোঝা যাবে সত্যিকারের প্রগতিশীল কোনো কোনো প্রগতিশীলকেও ফ্রয়েডবাদ কীভাবে ভ্রান্তির পথে আকর্ষণ করছে—আলেয়ার মতো। তারপর দেখা যাবে, এর মূলে ভ্রান্তিটা ঠিক কোথায়: কেমনভাবে এরই মধ্যে বিজ্ঞানকে বিসর্জন দেবার আয়োজন!

অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতিটা হলো : আপনি চোখ বুঁজে বিনাবিচারে কথা বলে যাবেন—যে-কোনো কথা আপনার মনে আসবে তাই, আপাতদৃষ্টিতে সে-সব কথা আপনার কাছে যতো অবান্তর, যতো আজগুবি, যতো অশ্লীল বা যতো এলোমেলোই মনে হোক না কেন। এক ফ্রয়েডপন্থী আপনার এই সব কথাগুলি থেকেই আপনার মানসিক অবস্থার হদিস বার করবেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো, অমন অবান্তর ও অর্থহীন শব্দরাশি থেকে আপনার মানসিক অবস্থার হদিশটা কেমন করে পাওয়া সম্ভব? উত্তরে ফ্রয়েডপন্থী বলবেন, প্রথম ঝোঁকে কথাগুলোকে যতোই অর্থহীন বা আজগুবি মনে হোক না কেন দুনিয়ার কোনো কিছু তো

সত্যিই অকারণে ঘটতে পারে না। অর্থাৎ কিনা, আপনার এই এলোমেলো কথাগুলোর পেছনেও একটা নির্দিষ্ট কারণ থাকতে বাধ্য আর সেই কারণটাই হলো আপনার মানসিক অবস্থা।

একটা খুব সাদা-মাটা নমুনা নেওয়া যাক। ধরুন, চোখ বুঁজে কথা বলতে বলতে আপনার মনে পরের পর দুটো চিন্তা উঠলো: —ক বাবুর কথা—শ্মশানের কথা—। ফ্রয়েডপন্থী বলবেন, এই যে দুটো কথা আপনার মনে পরের পর জাগলো এ-ব্যাপারকে তো আর অকারণ বলে উড়িয়ে দিতে পারবেন না। কেন জাগলো? তার একটা নির্দিষ্ট কারণ থাকতে বাধ্য। ক—বাবুর কথার পর শ্মশানের কথা কেন? শ্মশানের কথা না হয়ে অন্য কিছুর কথা হলো না কেন? তারও নিশ্চয়ই কোনো নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট কারণ থাকতে বাধ্য। ফ্রয়েডপন্থী তাই বলবেন, শ্মশানের চিন্তাটা তো অভ্রান্তভাবেই মৃত্যুবাচক এবং ক—বাবুর কথা মনে ওঠবার পরই এই মৃত্যুবাচক চিন্তা মনে জাগবার একমাত্র অর্থ হলো ক—বাবুর মৃত্যুকামনা করা। আপনি হয়তো তর্ক তুলে বলবেন, ক—বাবু আপনার বিশেষ বন্ধুলোক, অত্যন্ত প্রিয়জন; তাঁর মৃত্যুকামনা তাই আপনার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ও এমন কি অত্যন্ত পীড়াদায়ক। ফ্রয়েডপন্থী জবাব দেবেন, আপনার নিজের মন সম্বন্ধে কতোটুকু খবর বা আপনি নিজে রাখেন?—আসলে মৃত্যুকামনাটা রয়েছে আপনার নির্জ্ঞানে আর তাই জন্যেই ও সম্বন্ধে আপনার কোন হুস নেই। আপনার সজ্ঞানে ক—বাবু সম্বন্ধে যে-প্রীতি সেটাই তো আর আপনার মনের আসল খবর নয়। যে-নির্জ্ঞান মনের দিক থেকে আপনার আসল পরিচয় সেই নির্জ্ঞান যে ঘোরতর অসামাজিক আর অন্ধ যৌন তাড়না-মাত্র। যৌন তাগিদ আবার এর মধ্যে কোথায়? ফ্রয়েডপন্থী হয়তো আপনাকে দেখাবার চেষ্টা করবেন, ক—বাবুর পত্নীর

প্রতি আপনার এক গোপন আকর্ষণ আছে আর তাই ওই মৃত্যু-কামনা দিয়েই আপনি আপনার যৌন আকর্ষণকে নিষ্কণ্টক করতে চান।

এইখানে পাঠককে অনুরোধ করবো দুটো আলাদা-আলাদা কথার মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে সজাগ থাকতে। একটা কথা হলো, ফ্রয়েডপন্থীর মনে সাধারণভাবে কার্যকারণবাদে বিশ্বাস—প্রত্যেকটি মানসিক ঘটনার একটা কারণ থাকতে বাধ্য, সে ঘটনাটা আপাতত যতো তুচ্ছ বা যতো অর্থহীনই হোক না কেন। আর একটা কথা হলো, মানসিক ঘটনাগুলির নির্দিষ্ট কারণ নির্ণয় করার আশায় ফ্রয়েডপন্থীর বিশিষ্ট ব্যাখ্যা। দুটো কথা একেবারে আলাদা কথাস্তু। এবং এমন কি এই দুয়ের মধ্যে একটা অন্তর্বিরোধও বর্তমান। কেননা, প্রথম কথাটির মধ্যে বিজ্ঞান-নিষ্ঠার পরিচয়, দ্বিতীয়টি কিন্তু বিজ্ঞান-বিরোধী কল্পনার দাসত্ব-মাত্র এবং ভবিষ্যতে স্পষ্টভাবে দেখাবার চেষ্টা করবো, বিজ্ঞান-বিরোধী ওই কল্পনাকে ফ্রয়েড ধার করছেন প্লেটোর ভাববাদ থেকেই।

ওই কার্যকারণবাদের উপর সাধারণ আস্থাপ্রচারের ভিতর দিয়ে কীভাবে ফ্রয়েড বৈজ্ঞানিক মেজাজকে আকর্ষণ করেছেন, প্রথমে তারই আলোচনা তোলা যাক।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে ফ্রয়েডের আগে পর্যন্ত মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ছিলো সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কারের একচ্ছত্র আধিপত্য। স্বপ্নাদির তাৎপর্য নির্ণয় ব্যাপারে এই কথাটা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। কেননা ফ্রয়েডের আগে পর্যন্ত স্বপ্নাদিকে একান্তভাবেই আধ্যাত্মিক জগতের প্রভাব হিসেবে, অদৃশ্য আর অলৌকিক শক্তির ক্রিয়া হিসাবে—দেখবার চেষ্টা করা হতো। এবং এই সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ফ্রয়েডের প্রতিবাদই

প্রথম এবং অত্যন্ত বলিষ্ঠ। তিনি ঘোষণা করলেন, প্রত্যেক ব্যাপারেই জাগতিক ও সুনির্দিষ্ট কারণ আছে। তাই মানবমনের যে-কোনো ক্রিয়াকেই বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা কর সম্ভব। আপাতদৃষ্টিতে এই সব মানস ক্রিয়াকে অকারণ, অর্থহীন ও রহস্যময় মনে হতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানের আলোকপাত করতে পারলে প্রত্যেক মানস ক্রিয়ার নির্দিষ্ট কারণ ও নির্দিষ্ট অর্থ আবিষ্কার করা সম্ভব, সম্ভব তার উপরকার রহস্যজালকে বিদীর্ণ করা। আপনার এলোমেলো চিন্তা আপনার দৈনন্দিন খুচরো, ভুলচুক, আপনার স্বপ্ন ও এমন কি খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি আচরণেই নির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট ও লৌকিক কারণ থাকতে বাধ্য। তাই কোনো কিছুকেই অর্থহীন বা অলৌকিক মনে করা চলবে না। এ-কথা ফ্রয়েডের আগে পর্যন্ত আর কেউ অমন জোর দিয়ে ঘোষণা করতে পারেননি। তাছাড়া, মনে রাখা দরকার ফ্রয়েড যে-যুগে এই ঘোষণা করছেন সেই যুগটার কথা। স্বপ্ন প্রভৃতির কথা তো দূরের কথা এমন কি হিস্টেরিয়া প্রভৃতি স্থূল মানসিক রোগকেও তখন পর্যন্ত অধিকাংশ মানুষ ভূতে পাওয়া বা দেবতা-অপদেবতার ভর হওয়া বলে গণ্য করতো। অর্থাৎ এক কথায় সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কারেরই প্রতিপত্তি। আর তারই বিরুদ্ধে বুর্জোয়া বৈজ্ঞানিক প্রতিবাদ ফ্রয়েডের কণ্ঠে!

স্বভাবতই, তখনকার কালে সামন্ততান্ত্রিক মতাদর্শের প্রভাব ফ্রয়েডের বিরুদ্ধে দারুণ বাধা সৃষ্টি করতে চেয়েছে, আর এই বাধা দেখে ফ্রয়েড মনে করেছেন তাঁর দাবির বিরুদ্ধে সাধারণভাবে মানবসমাজেরই স্বাভাবিক প্রতিবন্ধ। অথচ, ভুললে চলবে না তখনকার যুগেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির শক্তিতে বলিষ্ঠ বিশ্বাস নিয়ে যে বৈজ্ঞানিক অপর এক দৃষ্টিকোণ থেকে মানস সত্তার প্রকৃত অর্থ অন্বেষণ করেছিলেন তিনি নিজে ফ্রয়েডের ওই

সাধারণ দাবিটায় ঔৎসুক্য বোধ না করে পারেননি। তিনি হলেন স্বয়ং পাভলভ। স্বপ্নাদি মানস ব্যবহারের বৈজ্ঞানিক অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে ফ্রয়েডের যে চেষ্টা পাভ্‌লভের কাছে সেই চেষ্টা অত্যন্ত জরুরী ও চিত্তাকর্ষক মনে হয়েছিলো। ফ্লভ লিখেছেন:

In dealing with the subject of dreams it is necessary to point out Pavlov's attitude to the theory of the Viennese psychiatrist Freud, that talented investigator and interpretor of dreams. We have in mind here only the first period of the activity of this scientist, viz. the time when he was interested in "the psychopathology of everyday life"...We speak here of the early views of Freud, who observed and attempted to comprehend many extremely interesting characteristics of the laws of human behaviour. Notably, he collected a wealth of data for the study of so-called involuntary mistakes: forgetting of proper names, slips of the tongue and of the pen, etc. Pavlov was very fond of putting forward Freud's first and clearest example, the forgetting of proper names even of close acquaintances, as a proof of the law of negative induction analysed by us above... Pavlov raised on objection either to Freud's conception of the forgetting of painful impressions, which nature endeavours to eliminate as it were by developing an inhibitory

state in the parts of the brain concerned, sometimes of a very intense character. Freud, however goes much further... (Pavlov and his School : Frolov p. 170-72).

অবশ্যই, ফ্রয়েড সম্বন্ধে এই উৎসাহ প্রদর্শন করা সত্ত্বেও পাভ্‌লভ মুহূর্তের জন্যেও ফ্রয়েডের মূল ভ্রান্তিকে প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত হননি। আর, আজকের দিনেও প্রত্যেক প্রগতিপন্থীর এই কথাটি স্পষ্টভাবে মনে রাখা খুবই প্রয়োজন। অর্থাৎ কিনা, অবাধ আনুষঙ্গ পদ্ধতি নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহের বশে ফ্রয়েডীয় কলাকৌশল সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি করে বসাটা নেহাতই ভুল হবে। দুঃখের বিষয়, প্রগতি শিবিরের কোনো চিন্তাশীলও এই রকমের ভুল সত্যিই করে বসেছেন। তাই বলছিলাম, ফ্রয়েডের এই অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতি আলেয়ার মতো আমাদের যেন ভুল পথে ভুলিয়ে নিয়ে যেতে চায়। অনেককে ইতিপূর্বেই ভুলিয়েছে বলেই এই সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনেক বেশি হুঁশিয়ার থাকা দরকার। নমুনা হিসেবে এখানে বিশেষ করে একজনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা দরকার। তাঁর নাম লুরীয়া (A.R. Luriaa); তিনি ছিলেন মস্কো-এর মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক। ফ্রয়েডীয় অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতিতে উৎসাহী হয়ে তিনি ঘোষণা করেছিলেন, মনঃসমীক্ষণ আসলে বস্তুবাদী বিজ্ঞানই এবং ফ্রয়েডীয় মতবাদগুলিকে পরীক্ষামূলকভাবে প্রমাণ করবার প্রচেষ্টায় তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। (তাঁর রচনা The Nature of Human Conflicts দ্রষ্টব্য)। অবশ্যই উত্তরকালে তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারেন এবং ফ্রয়েডবাদের তীব্র সমালোচনায় নিরত হন। কিন্তু আমাদের পক্ষে আপাতত যে-কথা বিশেষ মনে রাখা দরকার—পরীক্ষামূলকভাবে ফ্রয়েডীয় মতবাদকে প্রমাণ করবার

ওই যে-প্রচেষ্টা ওর পেছনে আসল কারণ হলো ফ্রয়েডীয় অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক মর্যাদা নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহ। আর এই মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহের বশে ভুলে যাবার সম্ভাবনা যে অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতির মূলে সাধারণভাবে কার্যকারণবাদের উপর বিশ্বাস যতোটাই বিজ্ঞানমুখিতার পরিচয় হোক না কেন, ফ্রয়েড যখন মানস ঘটনাগুলির নির্দিষ্ট কারণ নির্ণয় করবার চেষ্টা করেন তখন তিনি বিজ্ঞান-বিরোধী পৌরাণিক উপাখ্যানেরই দাস হয়ে পড়েন। মনে রাখতে হবে, ফ্রয়েডীয় প্রচেষ্টায় ওই বিজ্ঞানের অঙ্কুর পাভ্‌লভের চোখে পড়া সত্ত্বেও তিনি নিজে ফ্রয়েডের তীক্ষ্ণ সমালোচনা করতে বিরত হননি এবং সে-সমালোচনার প্রধান কথা হলো ফ্রয়েডের পক্ষে পৌরাণিক কল্পনার কাছে করুণ আত্ম-নিবেদন। ফ্রলভ লিখছেন:

The later productions of Freud, "the Ego and the Id" etc. in which he began to work out his new theory of the unconscious in the spirit of Hartmann, encountered the most energetic resistance and rejection on the part of Pavlov. This was only to be expected, since Pavlov and Freud were, as regards their interests, their views on life and on the tasks of the science of behaviour, two opposites who could hardly be combined. While Freud made use of intuition and mythology, and with progress of time buried himself ever more deeply in the mysteries of the "unconscious", even declining to employ modern objective methods of research, Pavlov, in

accordance with his unvarying character as a scientist concerned himself for the universal spread of the bright light of knowledge even where it was a question of the depths of pathological personality. And it is not to be wondered at that in so doing he sometimes had to shatter a mass of accumulated superstitions and prejudices, the development of which Freud's successors have done not a little to foster...Freud, however, goes much further; from his point of view human personality is the scene of a collition between on the one had obscure instincts, our unconscious desires that the chiefly of a sexual character, and on the other hand the inclination of our consciousness, of our "Ego", the letter being the result of education and the development of man in society... There is nothing to object to in the view that dreams may in some measure present a picture of unfulfilled wishes, perhaps even unknown to the subject himself, i.e. existing below the threshold of consciousness or, in Pavlov's terminology, inhibited and occuring outside the limits of the "illuminated" portion of the brain.

But this recognition..by no means signifies that the "complexes" thrust the unconscious sphere

must neccessarily belong to sexual reflexes or ideas, as Freud imagines.

Here Pavlov energetically opposed Freud's Views pointing out that any complex of stimuli under appropriate conditions can become inhibitory, and as much essentially influence the activity of the brain while itself remaining in the back ground or outside the main path of the usual working of the brain. (Pavlov and his School : Frolov, pp. 170-173).

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হলো। কিন্তু পাভ্‌লভের দৃষ্টিকোণ থেকে ফ্রয়েডকে যাচাই করবার এমন স্পষ্ট উদাহরণকে উদ্ধৃত করবার লোভ সংবরণ করা কঠিন। অবশ্যই এখানে স্বপ্নাদি সম্পর্কে পাভ্‌লভের বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করবার অবসর নেই, কেননা তাহলে পাভ্‌লভের মূল আবিষ্কার নিয়ে অত্যন্ত দীর্ঘ আলোচনা তুলতে হয় এবং সে-আলোচনার জন্যে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন। আপাতত যে-আলোচনা হচ্ছিল। ফ্রয়েড যখন সাধারণভাবে বলেন, প্রত্যেক মানসিক ঘটনার নির্দিষ্ট কারণ থাকতে বাধ্য এবং ঘটনাটি আপাতদৃষ্টিতে যতো তুচ্ছ বা অকারণই মনে হোক না কেন, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে তার নির্দিষ্ট কারণটি আবিষ্কার করা নিশ্চয়ই সম্ভব,—তখন ফ্রয়েডের দাবিটা নিশ্চয়ই বিজ্ঞানের দাবি। কিন্তু ওই নির্দিষ্ট কারণটির স্বরূপ নির্ণয় করবার আশায় তিনি যে-কাহিনী রচনা করছেন তার প্রাণবস্তু হলো পৌরাণিক কল্পনাই।

ওই সব পৌরাণিক কল্পনার রকম-সকম ঠিক কী রকম, —কেন আমরা ওগুলিকে বিজ্ঞান বলে স্বীকার না করে নিছক

পৌরাণিক কল্পনা বলতে বাধ্য,—তার আলোচনা পরে তোলা যাবে। কেননা সেটা ঠিক ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলের আলোচনা হবে না, তার বদলে হবে ফ্রয়েডীয় সিদ্ধান্তের ও মূল প্রতিজ্ঞার আলোচনা—যে প্রতিজ্ঞাগুলি তিনি আহরণ করেছেন য়ুরোপীয় দর্শনের সবচেয়ে বড়ো ভাববাদী দার্শনিক প্লেটোর কাছ থেকেই। আপাতত দেখা যাক, তাঁর কলাকৌশলের মধ্যে ঠিক কেমনতরো ফাঁকির সুযোগ থেকে গিয়েছে বলেই ওই জাতীয় পৌরাণিক কল্পনার প্রবেশটা সুগম হলো।

ফাঁকিটা হলো, কার্যকারণবাদেরই বিসর্জন। যে-কার্যকারণবাদের উপর বলিষ্ঠ আস্থা ঘোষণা করেই তাঁর মনোবিজ্ঞানের শুরু সেই কার্যকারণবাদকেই করুণভাবে ফ্রয়েড বর্জন করলেন, আর বর্জন করলেন মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরী মোড়ের কাছে পৌঁছে। কীভাবে? কোথায়? ওই মানস সত্য ও বাস্তব সত্যের মধ্যে চরম পার্থক্য কল্পনার ব্যাপারেই। কেননা, যাকে তিনি মানস সত্য বা Psychical reality বলছেন সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখলে তারও নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট কারণ থাকতে বাধ্য এবং সেই কারণটা বাস্তব সত্য বা material reality ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। কেননা, মানুষের মন এই পৃথিবীরই একটা অংশ—বাস্তব দুনিয়া ছাড়া তো সত্যিই কোনো রকম অপরূপ পদার্থ হতে পারে না। অথচ, ফ্রয়েডের কল্পনায় তাইই। অর্থাৎ কিনা, বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কহীন স্বাধিকারমত্ত এক সত্তা। তার মানে, এই মানস সত্যের স্তরে যে-সব নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটছে ফ্রয়েডীয় মতবাদ অনুসারে সেগুলির প্রত্যেকটিরই নির্দিষ্ট কারণ আছে—অকারণে কেউ স্বপ্ন দেখে না, ভুলে কেউ ভুল করে না, আপনার মনে যতোই এলোমেলো চিন্তার উদয় হোক না কেন, তার পেছনে নির্দিষ্ট কারণের প্রভাব

থাকতে বাধ্য। কিন্তু ফ্রয়েডকে যদি প্রশ্ন করেন, একজন মানুষের ওই যে মানস সত্তা সমগ্রভাবে দেখলেন তার কারণটা ঠিক কী? তাহলে ফ্রয়েডের তরফ থেকে সত্যিই কোনো জবাব নেই—কিংবা যে-জবাব তাঁর আছে সেই জবাবের মধ্যে বাস্তব পৃথিবীর সত্যিই কোনো স্থান নেই। তার মানে ফ্রয়েড কি এ-কথা মানেন না যে আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের উপর আমাদের মনোভাবটা নির্ভর করছে। নিশ্চয়ই জানেন। আজকের যুগে কোনো বৈজ্ঞানিকের পক্ষেই এ-কথা না মানবার প্রশ্ন ওঠে না, ফ্রয়েড নিজে বহুবার, বহুপ্রসঙ্গে অন্তত মৌখিকভাবে এ-কথা স্বীকার করেছেন। মৌখিকভাবে বলছি এই কারণে যে, ব্যাপারটাকে সত্যি বলে মানলেও এই দিকে বেশি উৎসাহ দেখানোয় ফ্রয়েডের বিশেষ আপত্তি, কেননা তাঁর মতে সে-উৎসাহ বড়ো জোর স্নায়ুতন্ত্রের উপর মানসিক অবস্থাবলীর স্থান-নির্ণয় (localization) করতে পারে, কিন্তু এই স্থান-নির্ণয় থেকে মানস সত্তার নিজস্ব রূপকে আবিষ্কার করবার সত্যিই কোনো হদিস পাওয়া যাবে না। (Outlines of Psychoanalysis দ্রষ্টব্য)। তাই, স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে মানস সত্তার সম্পর্ক স্বীকার করলেও সে-নিয়ে আলোচনা তোলায় ফ্রয়েডের সত্যিই কোনো উৎসাহ নেই। আর যদিই বা থাকতো তাহলেও শুধু সেইটুকুর গুণেই ফ্রয়েড প্রকৃত অর্থে বস্তুনিষ্ঠ—তাই বৈজ্ঞানিক—মনস্তাত্ত্বিকের মর্যাদা পেতেন না। কেননা শুধুমাত্র ওইটুকু স্বীকৃতিই বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞানের মূল কথা নয়। কেননা, মানবমনের জন্ম, স্থিতি ও লয় সব কিছুই একান্তভাবে স্নায়ুতন্ত্রের উপর নির্ভর করছে—শুধু এইটুকু বললে মনোবিজ্ঞানে বাস্তববাদী হওয়া যায় না। তার প্রমাণটা খুব কঠিন কথা নয়। সে-প্রমাণের আসলে দুটো কথা। এক হলো, ক্রমবিকাশের দিক থেকে দেখলে স্পষ্টই চোখে পড়ে যে গত

তিন-চার হাজার বছরের মধ্যে মানব-স্নায়ুতন্ত্রের গড়ন ইত্যাদির দিক থেকে খুব কিছু জরুরী তফাত তো সত্যিই ঘটেনি। অথচ, এই তিন-চার হাজার বছরের মধ্যেই আদিম সাম্যতন্ত্র থেকে শুরু করে আধুনিক সমাজতন্ত্র পর্যন্ত মানুষের যে-জয়যাত্রার ইতিহাস তার মধ্যে মানুষের মানসিক অদলবদলটা কতো দ্রুত আর কী গভীর! তাই শারীরতত্ত্বের দিক থেকে শুধুমাত্র স্নায়ুতন্ত্রের খবর কুড়িয়ে কারুর পক্ষেই প্রকৃত মনোবিজ্ঞানী হওয়া সম্ভব নয়, কিংবা, যা একই কথা, বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞানীর মুখে শুধু এইটুকু কথাই যথেষ্ট নয় যে, মানুষের মন একান্তভাবে তার স্নায়ুতন্ত্রের ওপর নির্ভর করে। কথাটার আর একটা দ্বিতীয় প্রমাণ আছে। ধরুন, আপনি বাংলাদেশের এক মধ্যবিত্ত ঘরে জন্মেছেন, বড়ো হয়েছেন ঔপনিবেশিক পরিবেশে। কিন্তু জন্মাবার পরেই আপনাকে যদি সোভিয়েট দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হতো আর আপনি যদি বড়ো হতেন ওই সমাজতান্ত্রিক পরিবেশে? তাহলে নিশ্চয়ই আপনার মনের গড়নটা অন্যরকমের হতো। কিন্তু তার মানেই কি এই যে আপনার মগজের গড়নটা যেতো বদলে? নিশ্চয়ই নয়। অমনতরো কথা অবশ্যই হাস্যকর। কিন্তু তার মানেই কি এই দাঁড়ায় না যে, শুধুমাত্র স্নায়ুতন্ত্রের বিশ্লেষণের মধ্যেই মানস সত্তার পূর্ণ পরিচয় পেতে চাওয়াটা মনোবিজ্ঞানে বাস্তব-বোধের পরিচয় নয়?

কিন্তু তার মানে কি এই যে বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞানী স্নায়ুতন্ত্রের কথা ভুলে মনোবিজ্ঞানের ভিত গাঁথতে চাইবেন? তাও নয় নিশ্চয়ই। মানবমনের ভিত্তিতে যে স্নায়ুতন্ত্রই, সেই কথাই হবে বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞানীর মূলসূত্র। কিন্তু শুধু ওইটুকু কথাই নয়। কেননা, তাঁর পক্ষে ভোলা চলবে না যে এই স্নায়ুতন্ত্রের আসল কাজ হলো বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে মানুষের ভারসাম্য বজায়

রাখবার কাজ, বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে মানুষকে খাপ খাওয়াবার কাজ। আর তাই, ওই স্নায়ুতন্ত্রের মধ্যস্থতাতেই আমাদের বাস্তব পরিবেশ প্রতিবিম্বিত হয় আমাদের মধ্যে—সেই প্রতিবিম্বেরই নাম হলো আমাদের মন। ফলে পরিবেশের পরিবর্তন ঘটে আমাদের মনের গড়নেও। অবশ্যই, প্রতিবিম্ব অর্থে এখানে নিশ্চল ও নিষ্ক্রিয় ছবিমাত্র মনে করলেও ভুল করা হবে। কেননা, মানুষের মন পরিবর্তনশীল পরিবেশের প্রতিবিম্ব হয়েও এই পরিবেশকে পরিবর্তন করবার ব্যাপারে অত্যন্ত জরুরী শক্তির কাজ করতে পারে।

এই কথাই হবে বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞানের মূলসূত্র। প্রসঙ্গত, পাভ্‌লভের গবেষণাও এই মূলসূত্রের উপরই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু ফ্রয়েড যখন মানস সত্য আর বাস্তব সত্যের মধ্যে তফাত করতে বলেন, যখন বলেন মানস সত্যকে বুঝতে গেলে শুধুমাত্র মানস সত্যের ভাষাতেই বোঝবার চেষ্টা করতে হবে,—তখন তিনি ভুলে যান তাঁর কার্যকারণবাদের কথা। মানস সত্যেরও যে একটা কারণ থাকতে বাধ্য এবং সেই কারণ যে তাঁর পরিভাষার ওই বাস্তব সত্যই—এই মূল কথাটিকে তিনি ভুলে যান বলেই তাঁর ওই বিস্মৃতির সুযোগ নিয়ে নানা রকম বিজ্ঞান-বিরোধী কল্পনা তাঁর মতবাদকে আচ্ছন্ন করবার অবকাশ পায়। আর তা তো হবার কথাই। কেননা ফ্রয়েড নিজেই স্বীকার করেছেন, মানস সত্য আর বাস্তব সত্যের মধ্যে তিনি যে-রকমের তফাত করতে বলেন সেই রকমের তফাত একবার মেনে নিলে পর fact আর fancy----বাস্তব ঘটনা আর কল্পনা----এ-দুয়ের মর্যাদা-বিচারেও কোনো রকম পক্ষপাতিত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ, তাঁর মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে ঐতিহাসিকভাবে যা সত্য তার মূল্য, আর যা কিনা নিছক কল্পনামাত্র তার মূল্য

একেবারে সমান! ফ্রয়েড বলছেন, তাঁর কলাকৌশলের প্রয়োগ-প্রসঙ্গে রোগীকে একটা কথা খুব স্পষ্টভাবে বোঝানো দরকার, কথাটি হলো phantasy and reality are to be treated alike (General Introduction, p. 322)। অর্থাৎ কিনা রোগীর বাস্তব জীবনে যে অভিজ্ঞতা ঘটেছে তার সঙ্গে রোগীর পক্ষে যেটা নিছক খেয়াল-খুশীর কল্পনা তার কোনো তফাতই নেই। বাস্তবের প্রতি শ্রদ্ধাকেই বৈজ্ঞানিকেরা চিরকাল বিজ্ঞানের মূল নিষ্ঠা বলে মেনে নিয়েছেন, অবিদ্যার পথে অগ্রসর হয়ে ফ্রয়েড এই বাস্তবকে একেবারে তুচ্ছজ্ঞান করতে বাধ্য হলেন। আর বাস্তবের মূল্য যদি ওইভাবে বর্জন করা হয় তাহালে সেই অবসরে পৌরাণিক কল্পনা আসর জমাবেই বা না কেন? ঈগো, ঈড্, সুপার-ইগো, লিবিডো, ঈডিপাস্ কম্‌প্লেক্স্—আরো কতো রকম। আর তাই ফ্রয়েড যখন বলেন, তাঁর কলাকৌশষল দীক্ষিত হতে গেলে দেশ-বিদেশের পৌরাণিক উপাখ্যানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটা দরকার, এবং তিনি নিজেই যখন আলোচনা-প্রসঙ্গে কথায় কথায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দোহাই পাড়েন তখন তার ফ্রয়েডীয় তাৎপর্য ছাড়াও একটা অন্য তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। তবে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এই অন্য তাৎপর্যটা পরিহাসের মতোই। কেননা এই অন্য তাৎপর্যটা হলো ফ্রয়েডবাদের সঙ্গে পৌরাণিক কল্পনার ঘনিষ্ঠ মিতালি। ঈগো, ঈড্, সুপার-ঈগো, লিবিডো, ইডিপাস, ঈরস্—এগুলির প্রকৃত পুরাণসর্বস্বতা নিয়ে একটু পরেই আলোচনা তোলা যাবে।

আপাতত দেখুন, তার কলাকৌশলের ক্ষেত্রে fact আর fancy-র মধ্যে, বাস্তব আর কল্পনার মধ্যে—তফাতটা ওইভাবে উড়িয়ে দেবার দরুন যে জরুরী ফল ফলেছে সেই ফলটার

কথা। ফলটা হলো, প্রতীকতা বা symbolism-এর দিকে ফ্রয়েডবাদের একটা একরোখা ঝোঁক। মনঃসমীক্ষকের সামনে আপনি যে-কোনো রকমের আচরণ করুন, যে-কোনো কথা বলুন, তিনি তার কোনো রকমের বাস্তব অর্থ গ্রহণ করতে নারাজ হবেন। কেননা, তাঁর কাছে প্রত্যেক কথার একটা না একটা প্রতীকী অর্থ আছে—এবং এই প্রতীকী অর্থটাই আসল অর্থ, বাস্তব অর্থটা মোটেই কোনো অর্থ নয়। আর ওই প্রতীকী অর্থ, ওর প্রাণবস্তু হলো এক অন্ধ ও নির্বিচার যৌন-ক্ষুধা। একটা নমুনা দেখুন। ধরুন খবরের কগজে ছবি বেরিয়েছে, চীনের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী কামান নিয়ে আগুয়ান হয়েছে মার্কিন আক্রমণের প্রতরোধে আর ওই ছবি দেখে আশায় আনন্দে টলমল করে উঠেছে আপনার মন। এর বাস্তব অর্থটা ঠিক কি তা নিশ্চয়ই আমাদের সকলের কাছেই সুস্পষ্ট। কিন্তু ফ্রয়েডপন্থীর কাছে যান, তিনি বলবেন আপনার মনস্তত্ত্বের দিক থেকে ওই বাস্তব অর্থটা একেবারেই অর্থহীন। আশায় আনন্দে আপনার মন যে কেন দুলে উঠেছে তার কোনো রকম হদিস ওই বাস্তব অর্থের কাছ থেকে পাবার আশা নেই। কেননা, সমস্ত ব্যাপারটারই একটা প্রতীকী অর্থ আছে আর সেইটেই হলো আসল অর্থ। প্রতীকী অর্থটা কী রকম? ফ্রয়েডপন্থী খুব সম্ভবত বলবেন, মুক্তি ফৌজের প্রতীকী অর্থ হলো পিতৃশাসনে নির্যাতিত ভ্রাতৃদল, কামানের প্রতীকী অর্থ হলো জনন-অঙ্গ এবং মার্কিন আক্রমণকারীর প্রতীকী অর্থ হলো নির্যাতক পিতামাত্র। তার মানে আপনি যে-ছবিতে আবেগ-উত্তেজনার সন্ধান পেয়েছেন, তার আসল কারণ হলো আপনার নির্জ্ঞান মন ওই ছবির তর্জমা করে অর্থ নির্ণয় করেছে যে আপনার ভ্রাতৃদল নির্যাতক পিতাকে এবার যৌনভাবে বিধ্বস্ত করতে এগিয়েছে!

এইখানে আমি বিশেষ করে যে-প্রশ্ন তুলতে চাই সেটা নিশ্চয়ই এই নয় যে প্রতীকী অর্থ বলে একান্তই কিছু আছে কিনা। কেননা, আমাদের মন যে অনেক কিছুই প্রতীকী অর্থে গ্রহণ করে তা তো আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতারই অন্তর্গত। তাছাড়া, শিল্পে-সাহিত্যেও প্রতীকের ব্যবহার এতো প্রচুর যে প্রতীক বলে ব্যাপারকেই একেবারে উড়িয়ে দিতে যাওয়াটা বাস্তববোধের কথা নিশ্চয়ই হবে না। কিন্তু ফ্রয়েডপন্থীর দাবি তো শুধু ওইটুকুই নয়। যদি তাই হতো তাহলে খুব কিছু তর্কের থাকতো না। কিন্তু ফ্রয়েডপন্থী বলবেন, প্রথমত প্রতীকগুলো সনাতন, কেননা মানুষের নির্জ্ঞান মনের গড়নটাই হলো সনাতন। দ্বিতীয়ত, সমস্ত প্রতীকেরই একটা যৌন তাৎপর্য বর্তমান, কেননা, নির্জ্ঞান মন বলতে অন্ধ আর আদিম যৌন ক্ষুধা ছাড়া কিছুই বোঝায় না। আর তৃতীয়ত, মানব-মনস্তত্ত্বের দিক থেকে সব কিছুরই বাস্তব ও ব্যবহারিক অর্থটা একেবারে অবান্তর। কেননা, সব কিছুরই একটা প্রতীকী অর্থ আছে আর সেই প্রতীকী অর্থটাই হলো আসল অর্থ। তাহলে ফ্রয়েডীয় প্রতীকবাদের একদিকে দেখা যায় তাঁর নির্জ্ঞান ও যৌনতত্ত্ব আর একদিকে বাস্তববিমুখতা। তাঁর নির্জ্ঞান ও যৌনতত্ত্বের সংক্ষিপ্ত আলোচনা একটু পরেই তুলবো। আপাতত ওই বাস্তববিমুখতার দিকে নজর রাখা যাক। কেননা, এর মধ্যেই ফ্রয়েডীয় অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতির চরম বিফলতা প্রকট হয়ে পড়ে। মনে রাখতে হবে, অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতি অনুসারে ফ্রয়েডপন্থী যখন রোগীর সমস্ত এলোমেলো কথার ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন তখন প্রতিটি কথার বাস্তব অর্থকে সযত্নে বিসর্জন দিয়ে তার প্রতীকী অর্থের দিকে রোগীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান। আর তাই, অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতির একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় রোগীর মন থেকে বাস্তবকে মুছে

ফেলবার চেষ্টা, রোগীকে এক আত্মকেন্দ্রিক ভাবলোকের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আর ফ্রয়েডীয় কলাকৌশলের চরম ব্যর্থতাও ঠিক এই কারণে। বাস্তবকে কোনোমতে ভুলতে পারবার মধ্যেই যদি মানুষের প্রকৃত মুক্তির সন্ধান থাকতো, তাহলে অবশ্যই অন্য কথা হতো। কিন্তু তা তো আর সত্যিই সম্ভব নয়। ওটা হলো, খরগোসের মতো ঝোপের মধ্যে মুখ গুঁজে দিয়ে বিপদ থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা। মুক্তির আসল পথ হলো মুখ গুঁজে দিয়ে বিপদ থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা। মুক্তির আসল পথ হলো বাস্তবকে স্পষ্টভাবে চিনতে পারবার পথ। Fredom is the recognition of necessity। তাই একমাত্র বিজ্ঞানের পথেই মানুষের প্রকৃত মুক্তি। অথচ, ফ্রয়েডপন্থীর পথ হলো বিপরীত পথ—বাস্তবকে ভুলতে শেখবার পথ। ও-পথটা তাই বিজ্ঞানের পথ নয়। ওই পথে এগিয়ে তাই মানসিক গ্লানির যন্ত্রণাটা ভোঁতা হয়ে যায়। ধর্মের মতো। মাদকের মতো।

ফ্রয়েডবাদের মূল প্রকল্প বা fundamental hypothesis বলতে নির্জ্ঞান এবং সংজ্ঞানের সঙ্গে তার দ্বন্দ্বের কথাকেই ধরতে হবে। এগুলির বৈজ্ঞানিক যাথার্থ্য কি কতোখানি সে-বিচার তো করতেই হবে। কিন্তু তার আগে দেখা যাক, দর্শনের ইতিহাসের কোন্ পর্যায় থেকে এগুলির উৎস। প্রথমে দুটো উদ্ধৃতিকে বিচার করে দেখুন:

...a terrible, fierce, and lawless class of desires exist in every man even in those of us who have every appearance of being decent people. Its existence is revealed in dreams...

আর—

When the rest of the soul the reasoning, gentle and ruling part of it, is asleep, then the bestial and savage part, when it has had its feel of food or wine, beings to leap about, pushes sleep aside, and tries to go and gratify its instincts. You know how in such a state it will dare everything, as though it were freed and released from all shame or discernment. It does not shrink from attempting incestrial intercourse in its dreams, with a mother

or with any man or god or beast. It is ready for any deed of blood, and there is no unhallowed food it will not eat. In a world it falls short of no extereme of folly or shamelessness.

কার রচনা থেকে এই উদ্ধৃতি? নিশ্চয়ই ফ্রয়েডের রচনা হতে পারতো। কেননা বলবার মোদ্দা কথাটায় ফ্রয়েডের সঙ্গে এতোটুকুও অমিল নেই। কিন্তু এ-উদ্ধৃতি ফ্রয়েডের রচনা থেকে সত্যিই নয়। তার বদলে য়ুরোপীয় দর্শনের ইতিহাসে যিনি সবচেয়ে চূড়ান্ত ভাববাদী দার্শনিক তাঁর রচনা থেকেই। অর্থাৎ কিনা কথাগুলো স্বয়ং প্লেটোর কথা (Republic IX, 573 ও 571)। তার মানে, এই বিংশ শতাব্দীর চিন্তাশীল সিগ্‌মুন্ড ফ্রয়েড অনেক রকম আপাত-বৈজ্ঞানিক দোহাই দিয়ে যে-মনস্তত্ত্বের খসড়া করলেন সেই মনস্তত্ত্বও প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরোনো আর চরম ভাববাদী—অতএব বিজ্ঞান-বিরোধী—এক দার্শনিক কল্পনার ওপরেই প্রতিষ্ঠিত!

আপত্তি জানিয়ে কেউ নিশ্চয়ই বলতে পারেন, প্লেটো থেকে মাত্র দুটো খাপছাড়া উদ্ধৃতিকে সম্বল করে এতো বড়ো একটা কথা বলে বসা নেহাতই হঠকারিতার লক্ষণ! উত্তরে বলবো, উদ্ধৃতি দুটো প্লেটোর রচনায় কোনো খাপছাড়া ব্যাপার সত্যিই নয়। কেননা, প্রতিক্রিয়ার শিবিরে প্লেটো যতো বড়ো অধিনায়কই হোন না কেন, অসংলগ্ন চিন্তার অপবাদ তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অস্বাভাবিক—অর্থাৎ, স্বপ্নাদি সম্বন্ধে তাঁর ওই উক্তির মূলে রয়েছে মনস্তত্ত্বের এক নির্দিষ্ট মতবাদ, মানবমনের এক নির্দিষ্ট কাঠামোর কল্পনা, আর যেটা বিশেষ করে নজর করবার কথা, সেই কাঠামোর সঙ্গে ফ্রয়েডীয় কাঠামোটার মূলে কোনো তফাত নেই।

প্রথমে ওই প্রথমে ওই প্লেটোনিক কাঠামোটাই কথা বিচার করা যাক, তাহলেই ধরা পড়বে ফ্রয়েডীয় কাঠামোর সঙ্গে তার মিল কতো মৌলিক।

মানস সত্তাকে প্লেটো মোটের ওপর তিনটি স্বাধীন অংশে ভাগ করতে চেয়েছেন। তাঁর পরিভাষায় এই তিনটির নাম হলো desiring, reasoning আর spirited অংশ। অর্থাৎ, প্লেটোর মতে আমাদের মনের যে-তিনটি ভাগ তার মধ্যে একটি নিছক অন্ধ বাসনামাত্র, আর একটি নিছক বিচারবিবেক, আর তৃতীয়টির নাম তিনি দিচ্ছেন সংগ্রামী অংশ। সংগ্রাম মানে অবশ্যই, বেঁচে থাকবার ব্যাপারে আমাদের পক্ষে যে-ভাবে আত্মরক্ষা করা একান্তই প্রয়োজন তাইই। আর দীর্ঘ তর্ক তুলে প্লেটো প্রমাণ করতে চাইছেন এই তিনটি অংশ স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। এমন কি, ওই তিনটি অংশের মধ্যে প্রবল বিরোধ ও দ্বন্দ্ব। বিরোধটা অবশ্য সবচেয়ে তীব্র ওই অন্ধ বাসনা আর বিবেক-বুদ্ধির মধ্যেই—সংগ্রামী অংশটাকে তাই প্রায়ই এ-বিরোধের মধ্যস্থতা করতে হয়। তার মধ্যস্থতা যদি না থাকতো তাহলে বাসনা আর বিবেকের দ্বন্দ্বে আমরা একেবারে টুকরো টুকরো হয়ে যেতাম। (Republic, Bk. IV)

এর পাশাপাশি ফ্রয়েডীয় কাঠামোটা মিলিয়ে দেখুন। ফ্রয়েডও মানবমনকে তিনটি স্পষ্ট অংশে ভাগ করতে চান। তাঁর মতেও এই তিনটি অংশের মধ্যে বিভাগ অত্যন্ত স্পষ্ট—তিনটি অংশই স্বাধীন, স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বাধিকারমত্ত। শুধু তাই নয়; এদের ভিতর দুটি অংশের মধ্যে বিরোধ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। তাঁর পরিভাষায় সেই দুটি অংশের নাম Id এবং Super Ego। ফ্রয়েডের ওই ঈড্ অন্ধ বাসনা ছাড়া আর কিছুই নয়—সে শুধুই নিজের তৃপ্তি চায়, চায় ওই তৃপ্তির পথে বিবেক-বিচারের বা Super Ego-র

সমস্ত রকম বাধাবিঘ্ন অগ্রাহ্য করে এগুতে। অপর পক্ষে সুপার-ঈগোই আমাদের বিচার-বিবেক। তাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, অন্ধ বাসনার ওই তাগিদকে খর্ব করবার। ফলে ঈড্ এবং সুপার-ঈগোর মধ্যে সংঘাতটা অত্যন্ত তীব্র—ঠিক প্লেটো যে-ভাবে কল্পনা করেছেন, বাসনা আর বিবেকের মধ্যে সংঘাত ও দ্বন্দ্বের। আর প্লেটোর মতোই ফ্রয়েড বলতে চান, এই সংঘাতের মধ্যস্থতা করছে আমাদেরই মনের এক তৃতীয় অংশ। ফ্রয়েডের ভাষায় তারই নাম ঈগো বা Ego, অর্থের দিক থেকে এই অংশই হলো আমাদের মনে বাস্তবের প্রতিনিধি, বা এক কথায়, বাস্তববোধ বলে মনের অংশটা। এই বাস্তব-বোধের কৃপাতেই আমরা জীবনসংগ্রামে টিঁকে যাই। তাই একে প্লেটোর spirited element-এর সঙ্গে তুলনা করাটা মোটেই বাড়াবাড়ি হবে না।

এইখানে, প্লেটোর সঙ্গে ফ্রয়েডের তুলনা-ব্যাপারে আরো একটি দ্রষ্টব্য বিষয় আছে। সুপার-ঈগো-আর ঈগো—এই ফ্রয়েডীয় নামকরণ থেকেই বুঝতে পারা যায় যে, ফ্রয়েডের মতে এই দুয়ের মধ্যে যোগাযোগটা ঘনিষ্ঠ। অর্থাৎ, যদিও বা বাসনা আর বিবেকের দ্বন্দ্বে এই বাস্তব-বোধই মধ্যস্থতার কাজ করে তবুও আসলে ঈগোর পক্ষে ওই সুপার-ঈগোর দিকেই পক্ষপাত। আর এই কথাতেও ফ্রয়েড-প্লেটোর মিলটা বেশ ঘনিষ্ঠই। প্লেটো বলছেন :

Then we shall have reason in affirming that these are two and distinct from one another. The first, that with which the soul reasons, we shall call the rational part; the second, that with which it loves, and hungers and thirsts, and flutters round

the other desires, we shall call the irrational and desiring part, the companion of various indulgences and pleasures...Now, is spirit or that by which we feel indignant, a third part, or, with which of these two is it naturally connected?...Rather in the war of the soul it rages itself on the side of the rational part. (Plato : Republic. Book IV, 439-440).

অবশ্যই, সাধারণভাবে ফ্রয়েডীয় কাঠামোর সঙ্গে প্লেটনিক চিন্তার মিলটা এতোখানি সুস্পষ্ট হলেও ফ্রয়েডীয় বক্তব্যের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন ধরুন, ফ্রয়েড বলবেন, অন্ধ বাসনা বলে মনের ওই অংশটা আসলে নির্জ্ঞান এবং তার একমাত্র চাহিদা হলো যৌন চাহিদা। প্লেটো অবশ্যই ফ্রয়েডের মতো ফলাও করে নির্জ্ঞান-তত্ত্বের আলোচনা ফাঁদেননি এবং ফ্রয়েডের মতো যৌন শব্দের অর্থকে ব্যাপকতর করে সমস্ত রকম বাসনাকেই যৌন বাসনা আখ্যা দিতে চাননি। কিন্তু এই জাতীয় তফাতের কথাটা আসলে সত্যিই বড়ো কথা নয়। কেননা, স্বপ্ন সম্বন্ধে প্লেটোর যে-উক্তি ইতিপূর্বে উদ্ধৃত করেছি তার স্পষ্ট তাৎপর্য হলো প্লেটোর মতেও মানবমনের বাসনাময় অংশটা সম্বন্ধে আমরা সবসময় সচেতন নই, ঘুমের ঘোরে যখন আমাদের সচেতন বিচারবুদ্ধিটা ঢলে পড়ে তখনই ওই বাসনাময় অংশটি আত্মপ্রকাশের সুযোগ পায়। তাই, প্লেটোর তরফ থেকেও একে নির্জ্ঞান বলে মানতে কোনো বাধা নেই।

অবশ্য, খুঁটিনাটির দিক থেকে ফ্রয়েডীয় বক্তব্যের সঙ্গে প্লেটনিক বক্তব্যের মিল ঠিক কতোখানি তারই বিশদ আলোচনা তোলা আমার উপস্থিত উদ্দেশ্যের বাইরে, আমি শুধু দেখাতে

চাই যে ফ্রয়েড মানব-মনস্তত্ত্বের যে-কাঠামো আমাদের সামনে পেশ করেছেন, তা আসলে কোনো ভূয়োদর্শনের ভিত্তিতে পাওয়া বৈজ্ঞানিক সামান্যকরণ বা scientific generalisation নয়, এর পেছনে রয়েছে এক অতি প্রাচীন ভাববাদী দর্শনের প্রভাব।

এইখানেই অবশ্য কেউ তর্ক তুলে বলতে পারেন: প্লেটোর সঙ্গে ফ্রয়েডীয় উপসংহারের সাদৃশ্যটা সত্যিই চিত্তাকর্ষক। কেননা, এই সাদৃশ্য থেকে বুঝতে পারা যায়, বিশুদ্ধ চিন্তার নির্ভয়ে প্লেটো যে তথ্যের সন্ধান পেয়েছিলেন ফ্রয়েডও শেষ পর্যন্ত সেইখানেই পৌঁছলেন, যদিও অন্য পথে অগ্রসর হয়ে, কেননা, ফ্রয়েডীয় পথটা হলো, অভিজ্ঞতা-লব্ধ বাস্তব দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবার পথ। কিন্তু বিশুদ্ধ দার্শনিক চিন্তা আর অভিজ্ঞতা—এই দুটি বিপরীত পথ যদি শেষ পর্যন্ত একই উপসংহারে পৌঁছোয় তাহলে তার থেকে তো উপসংহারের যাথার্থ্যই প্রমাণিত হয়। তাই প্লেটোর সঙ্গে সাদৃশ্য-প্রদর্শন ফ্রয়েডবাদের সমালোচনা নয়, ফ্রয়েডবাদের সমর্থনেই পর্যবসিত হতে বাধ্য।

উত্তরে বলবো, পূর্বপক্ষের ওই যুক্তিটার গোড়াতেই গলদ রয়েছে। কেননা মানব-মনস্তত্ত্বসংক্রান্ত প্লেটোর ওই সিদ্ধান্তও আসলে বিশুদ্ধ দার্শনিক চিন্তার ফল নয়, তার মধ্যে সমাজ বাস্তবেরই প্রতিচ্ছবি। প্লেটোর *রিপাব্লিক্টা* ভালো করে পড়লে এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কেননা, প্লেটোর নিজেই খুব স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন যে মানবমনের এই তিনটি অংশকে অনুমান কয়ার পক্ষে একমাত্র উপাত্ত বা data হলো মানুষের সমাজ-সম্পর্ক। মানবসমাজকে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে রয়েছে তিন শ্রেণীর মানুষ: এক দল অন্ধের মতো শুধু গতর খাটাচ্ছে, শুধুমাত্র বেঁচে থাকবার তাগিদেই তারা অস্থির। আর এক দল হলো চিন্তাশীলের দল,

তারা শুধুই মাথা খাটায়, শুধুই বিচার করে। আর তৃতীয় দলটার নাম তিনি দিচ্ছেন যোদ্ধার দল, ক্ষত্রিয়ের দল—সমাজটাকে রক্ষা করবার ভার তাদের ওপর। আর প্লেটো বলছেন, সমাজ বাস্তবে যদি ওই তিন চরিত্রের মানুষ দেখতে পাওয়া যায়, তাহলে নিশ্চয়ই অনুমান করতে হবে মানবচরিত্রের মধ্যেও এই তিন রকমের বৈশিষ্ট্য বর্তমান। তাই, মানবাত্মার একটা অংশ হলো ওই অন্ধ বাসনা, আর একটা অংশ হলো বিশুদ্ধ বিচার বিবেক, আর তৃতীয় অংশের নাম প্লেটোর ভাষায় সংগ্রামী অংশ।

এইখানে, প্রসঙ্গত, একটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক বিষয়ের প্রতি নজর না পড়ে পারে না। আমাদের দেশের প্রাচীনেরাও সমাজ বাস্তবকে প্রধানত তিন অংশ বিভক্ত বলে মনে করছেন: ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। আর ব্রাহ্মণ তাঁদের কাছে সত্ত্বগুণ প্রধান, ক্ষত্রিয় রজঃগুণ-প্রধান, বৈশ্য তমঃগুণ-প্রধান। ফলে, মানব- মনস্তত্ত্বের কাঠমো নির্ণয় করবার সময় তাঁরাও প্লেটোর মতোই মনকে তিনটি স্বাধীন বৃত্তিতে ভাগ করতে চাইলেন: সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। এর সঙ্গে, আসলে প্লেটনিক কল্পনার খুব মৌলিক তফাত নেই—প্লেটোর ওই reasoning, spirited আর desiring অংশের তুলনা করে দেখুন। আর এই সঙ্গেই মনে রাখতে হবে, আধুনিক য়ুরোপের সাবেকী মনোবিজ্ঞানও মানবমনকে তিনটি স্বতন্ত্র বৃত্তিতে ভাগ করবার চেষ্টার উপরই প্রতিষ্ঠিত। সাবেকী পরিভাষায় তার নাম হলো thinking, feeling and willing। এর পাশাপাশি কান্ট-এর Theoretical reason, Judgement এবং Practical reason-এর কথাটাও মনে রাখবেন। কিন্তু এইসব সাদৃশ্য থেকে কি এমন কোনো কথা আন্দাজ করা যায় যে শ্রেণীসমাজের মনস্তত্ত্ব শ্রেণীসমাজের প্রতিবিম্ব হলেই তা এ-হেন একটা ত্রয়ীকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়ে পারেনি?

আর তাই জন্যই হয়তো বা ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের পক্ষে এই ত্রয়ীকরণ থেকে নিস্তার পাওয়া সম্ভব হয় নি। তার মানেই কিন্তু, মনস্তত্ত্ব যতোদিন পর্যন্ত এই রকম ত্রয়ীকরণের হাত থেকে নিস্তার লাভ না করছে ততোদিন পর্যন্ত তার পক্ষে প্রকৃত বিজ্ঞানের স্তরে উঠে আসা সম্ভব নয়। অবশ্যই এটা একটা স্বতন্ত্র আলোচনা এবং অনিবার্যভাবেই অত্যন্ত দীর্ঘ আলোচনা। *পুরোনো প্রশ্ন আর নতুন পৃথিবী গ্রন্থে* এই আলোচনাকে সাধ্যমতো সম্পাদন করবার চেষ্টা করেছি।

বিজ্ঞান, সহজবৃত্তি আর ঈডিপাস্ কম্প্লেক্স্

ফ্রয়েড-প্রসঙ্গ হয়তো এইখানেই শেষ হতে পারতো। কিন্তু পাঠকসাধারণ নিশ্চয়ই ফ্রয়েডের কয়েকটি মূল সূত্রের উপর স্পষ্ট উক্তি দাবি করবেন। ফ্রয়েডের কলাকৌশলের মূলে ভাববাদ ও ধর্মের প্রেরণা, তাঁর মূল প্রকল্পের মধ্যে প্লেটনিক দর্শনের ছাপ—যদিই বা তা মেনে নেওয়া হয় তাহলে প্রশ্ন থেকে যাবে ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞান, সহজবৃত্তি ও যৌনতাগিদ এবং ঈডিপাস্ কম্প্লেক্স্ প্রভৃতি সম্বন্ধে সমালোচকের মন্তব্য কী হবে।

বলাই বাহুল্য, ফ্রয়েডের কলাকৌশলই ফ্রয়েডবাদের আসল ভিত্তি। তারই মধ্যে যদি অমন গলদ থেকে যায় তাহলে ফ্রয়েডবাদের ইমারতটিও ঠুনকো হতে বাধ্য। অর্থাৎ, যে-অর্থে তিনি নির্জ্ঞান, সহজবৃত্তি ইত্যাদির কথা তোলেন তা বৈজ্ঞানিক সত্য নয়, কল্পনাবিলাস-মাত্র। এই আলোচনা সংক্ষেপে করবার চেষ্টা করা যাক।

প্রথম ধরা যাক নির্জ্ঞানের কথা। যদি প্রশ্ন ওঠে, আমাদের মানস সত্তার সবটুকু সম্বন্ধেই আমরা সবসময় সচেতন কিনা, তাহলে নিশ্চয়ই এবার জোর দিয়ে বলতে হবে তা নয়। নিছক শারীরতত্ত্বের দিক থেকেই তা সম্ভব নয়। কেননা, আমাদের মানস সত্তার শারীরিক ভিত্তি হলো আমাদের মস্তিষ্ক, মস্তিষ্কের উদ্দীপনার নামই চেতনা আর এই মস্তিষ্কের সবটুকু সবসময় সমানভাবে উদ্দীপ্ত নয়। এ-বিষয়ে পাভ্‌লভের উক্তি মনে রাখা দরকার :

...consciousness appears as a nervous activity of a certain part of the cerebral hemispheres, possessing at the given moment under the present conditions certain optimal (probably moderate) excitability. At the same time all the remaining of the parts hemispheres are in a state of more or less diminished excitability. ...The area of optimal activity is, of course, not fixed; on the contrary it is perpetually migrating over the whole extent of the hemispheres, being dependent on the relations which exist between the different centres as well as on the influence of external stimuli. The borders of the region of lowered irritability obviously change in conformity with those of the area of excitaion.

If we could look through the skull into the brain of a consciously thinking person, and if the place of optimal excitability were luminous, then we should see playing over the cerebral surface, a bright spot with fantastic, waving borders constantly fluctuating in size and form, surrounded by a darkness more or less deep, covering the rest of the hemispheres. Lectures on Conditioned Reflexes, pp, 221-222).

মস্তিষ্কের যে-অংশকে পাভ্লভ্ "in a state of more or less diminished excitability" বলে বর্ণনা করছেন তার ফলাফলকে মানস সত্তার দিক থেকে যদি অবচেতন বা unconscious বলে বর্ণনা করা হয় তাহলে হয়তো

বিজ্ঞান-বিচ্যুতির সম্ভাবনা নেই। ফ্রয়েড বলেন, ওই নির্জ্ঞান আমাদের মনের এক অন্ধকার প্রদেশের মতো, তার মধ্যে যেন ওত পেতে রয়েছে রকমারি দৈত্যদানো—যেন এক রূপকথার গল্প। আর ওইটেই হলো ফ্রয়েডবাদের কল্পনা। আর ওটা যে কল্পনাই তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ হলো মানস সত্তার ওই তথাকথিত অন্ধকার প্রদেশটির ভিত্তি ঠিক কী—স্নায়ুতন্ত্রের বর্ণনায় তার রূপটা কী রকম হবে—এ প্রশ্নের কোনো জবাব ফ্রয়েডীয় সাহিত্যে নেই। শুধু তাই নয়, ফ্রয়েডীয় মতে ওই নির্জ্ঞান মনই আমাদের সমস্ত রকম সচেতন আচরণ-বিচরণ, চিন্তা-বিচারকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। পুতুলনাচের কলকাঠি নাড়া যেন। এই কথা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হতো যদি পাভ্‌লভের পরীক্ষায় দেখা যেতো মস্তিষ্কের অপেক্ষাকৃত দুর্বলভাবে উদ্দীপিত অংশগুলি যে-সব conditioned reflex-এর কেন্দ্র সেই conditioned reflexই মস্তিষ্কের প্রবলতর উদ্দীপিত কেন্দ্রের conditioned reflex কে নিয়ন্ত্রণ করছে। কিন্তু পরীক্ষায় তা কখনো ধরা পড়েনি:

In the region of the brain where there is optimal excitability, new conditioned reflexes are easily formed, and differentiation is successfully developed. That area is at the given moment the creative part of the hemispheres. The outlying parts with their decreased irritability are incapable of such performance, and their functions at best concern the perviously elaborated reflexes arising in astereotyped manner. In the presence of the corresponding stimuli. The activity of these

areas is subjectively described as unconscious, automatic. (Ibid, p. 221)

গবেষণাগারে পরীক্ষামূলকভাবে এই তথ্য প্রতিষ্ঠিত হবার পরও যদি কেউ দাবি করেন সচেতন মন একান্তভাবেই নির্জ্ঞানের নির্দেশ মেনে চলে তাহলে সে দাবির বৈজ্ঞানিক মূল্য স্বীকার করবার প্রশ্নই ওঠে না।

ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞানতত্ত্বের সঙ্গে সহজবৃত্তি সম্বন্ধে তাঁর মতামতের গভীর যোগাযোগ। তিনি মনে করেন, আমরা জন্মাবার সময়েই কতকগুলি সহজবৃত্তি নিয়ে জন্মাই। নমুনা হিসেবে ফ্রয়েড যৌনবৃত্তি, জিঘাংসাবৃত্তি ইত্যাদি রকমারি সহজবৃত্তির উল্লেখ করেছেন। ফ্রয়েডের মতে, আমাদের মনের গড়ন একান্তভাবেই এই সহজবৃত্তিগুলির উপর নির্ভর করে। তাই, বাস্তব পরিবেশ আমাদের মানসিক গড়নের উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। শুধু তাই নয়, এই সহজবৃত্তিগুলি ফ্রয়েডের মতে একান্তই সনাতন ও অপরিবর্তনীয়। আদিম যুগেও যে-রকম ছিলো আজকের দিনেও ঠিক সেই রকমই। এবং জীবতত্ত্বের দিক থেকে ফ্রয়েড এই সহজবৃত্তিগুলির সনাতনত্ব ব্যাখ্যা করবার একটা চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন, এই সহজবৃত্তিগুলির বাস্তব ভিত্তি হলো ক্রোমোসোমের ভিতরকার ওই জিন। অর্থাৎ, সাবেকী জীববিজ্ঞানের ক্রোমোসোমবাদের দোহাই দিয়ে বহির্বাস্তবের প্রভাবকে অস্বীকার করবার এবং মানব-মনস্তত্ত্বের সনাতনত্ব প্রমাণ করবার চেষ্টা। তাই, সাম্প্রতিক কালে ওই সাবেকী ক্রমবিকাশবাদের ভিত্তি যে-ভাবে টলেছে তার উল্লেখই এই প্রসঙ্গে ফ্রয়েডবাদের একটা মূল সমালোচনা হতে পারে: বংশগতসূত্রে পাওয়া জন্মগত লক্ষণগুলি পারিপার্শ্বিকের প্রভাব-উত্তীর্ণ সনাতন কিছু নয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আরো একটি জরুরী কথা মনে রাখা দরকার। কথাটা হলো,

instinct—সহজবৃত্তি সম্বন্ধে পাভ্‌লভের মন্তব্য। পাভ্‌লভ দেখাচ্ছেন, সাবেকী মনোবিজ্ঞানে যাকে instinct বলে স্বীকার করা হয়েছে তা আসলে unconditioned reflex, আর কিছুই নয়। এই মন্তব্য কিন্তু অত্যন্ত জরুরী, একে শুধুমাত্র পরিভাষার তফাত বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। কেননা, সমস্ত reflex,—তা সে conditionedই হোক আর unconditionedই হোক-বহির্বাস্তবের সঙ্গে প্রাণিদেহের এক রকম না এক রকম আদান-প্রদান। Reflexএর একটা প্রান্ত যে বহির্বাস্তবেরই উদ্দীপনা! তাই তথাকথিত instinct বা সহজবৃত্তিগুলিকে unconditioned reflex বলে দেখানো মানেই হলো তাদের মানসসর্বস্বতা খণ্ডন করা, বহির্বাস্তবের সঙ্গে যোগসূত্রের উপর জোর দেওয়া। ফ্রলভ তাই বলছেন:

Hence, an instinct is an effect and not an internal impulse as was believed by the Stoics, who first introduced the word. (Pavlov and his School, pp. 34-35)

তাছাড়া ফ্রয়েড যে-ভাবে সহজবৃত্তিকে সনাতন মনোময় আভ্যন্তরিক তাগিদ বলে প্রচার করবার চেষ্টা করেছেন, সেটা যে নেহাতই তাঁর মনগড়া ব্যাপার এ-কথা তাঁর সহজপ্রবৃত্তির তালিকা থেকে প্রধানতম নমুনাটিকে বিশ্লেষণ করলেই দেখতে পাওয়া যাবে। ধরা যাক, ওই জিঘাংসা-বৃত্তি বা aggression instinct এর কথা। এ-বিষয়ে গবেষণার ভিত্তিতে Maslow ফ্রয়েডের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত প্রমাণ উদ্ধৃত করেছেন:

(১) প্রাণিজগতে ওই জিঘাংসাবৃত্তিকে কোনো সার্বভৌম নিয়ম মনে করাটা নেহাতই ভুল। প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই ধ্বংসের নেশা নেই। বরং, ক্রমবিকাশের পথ ধরে যে-প্রজাতি যতোদূর এগিয়েছে ততোই দেখা যায় তার মধ্যে ওই জিঘাংসাবৃত্তির

অভাব। যেমন ধরুন, সিমপান্জীর কথা—ক্রমবিকাশের ধারায় মানুষের ঠিক নিচেই তার স্থান। এই প্রাণীর মধ্যে জিঘাংসার চেয়ে সহযোগিতার বিকাশ অনেক প্রবল। (অথচ, জিঘাংসা-বৃত্তিকে সনাতন সহজবৃত্তি বলে প্রমাণ করবার আশায় ফ্রয়েড জোরালো যে-যুক্তি দিতে চান তা হলো প্রাণিজগতে তার সার্বভৌম লীলা)।

(২) শিশুদের ব্যবহার সংস্কারমুক্তভাবে বিচার করলে স্পষ্টই দেখা যায় তাদের মধ্যে জিঘাংসার তুলনায় স্নেহ, মমতা ও প্রীতির বিকাশ খুব কম নয়।

(৩) পর্যটকেরা বহু আদিম কোমের মধ্যে ঘুরে দেখেছেন তাদের জীবন যাত্রার মধ্যে জিঘাংসাবৃত্তির প্রায় সম্পূর্ণ অভাব।

(A. B. Maslow : A Comparative Approach to the Problem of Destructivencess Psychiatry. Vol. 5, 1942)

ফ্রয়েডের তথাকথিত Oedipus Complex সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা, ফ্রয়েড নিজে যদিও মনে করেন এই রকম মানসিক জটিলতা সমস্ত যুগের সমস্ত মানুষের মধ্যেই সমানভাবে বর্তমান তবুও কিন্তু নৃতত্ত্বের আধুনিক গবেষণায় সে-কথা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকৃত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে Ruth Benedict এর Patterns of Culture, Margaret Mead-এর From the South Seas, Abram Kardiner-এর The Individual & His Society, ইত্যাদি রচনা বিশেষ করে দ্রষ্টব্য। আর তা হবে নাই বা কেন। ওই তথাকথিত Oedipus Complex-এর মধ্যে পিতৃপ্রধান আধুনিক বুর্জোয়া-পরিবারেরই অভ্রান্ত প্রতিবিম্ব। ফ্রয়েড তাকে সর্বকালীন মানবচরিত্র বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করলে কেমন করে চলবে?